রাশিয়া দেখে এলাম

রণেন মুখোপাধ্যায়

ন্যাশনাল পাবলিশার্স
২০৬ বিধান সরণী : কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ :
জুলাই, ১৯৫৯

প্রকাশক :
গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
ন্যাশনাল পাবলিশার্স
২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা—৬

মুদ্রক :
রণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
নিউ টাইমস্ প্রিণ্টার্স
২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদ :
সুখেন গুপ্ত

উৎসর্গ

স্বর্গত ডি. পি. ধরের স্নেহ ও
সান্নিধ্যের স্মৃতির উদ্দেশে

নভেম্বর মাস। তখনও দিল্লী শহর কুয়াশার আস্তরণে ঢাকা। ঘরের ভিতর অন্ধকার। ছ'কাপ কফি নিয়ে শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় আমার সামনে এসে বসলেন। "এ কী! আপনি এখনও জামা-কাপড় পরেননি?" আমি বললাম, "বড্‌ডো শীত যে।" শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় হেসে উঠলেন—"আচ্ছা রণেনবাবু, দিল্লীর এই শীতে আপনার যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে মস্কো পৌঁছে আপনার কি হবে? কাল এ রকম সময়ে আপনি মস্কোতে। দিল্লী থেকে কিছু নাহোক দশগুণ ঠাণ্ডা তো হবেই!"

শুধু ঠাণ্ডা নয়, এই নভেম্বর মাসে রাশিয়ার শীতের অন্য ইতিহাসও আছে। নেপোলিয়ন রাশিয়ায় এসে মার খেয়েছিল যত-না রুশ সৈন্যের, তারচেয়ে বেশী বরফ-জমানো ঠাণ্ডার। ১৮১২ সালের অক্টোবর মাসে নেপোলিয়ন মস্কো শহরের প্রবেশ-মুখ থেকে সব খুইয়ে রাশিয়া জয়ের আশা ত্যাগ করে ফিরে গিয়েছিল—তারও একটা কারণ, শীতের মার। রুশ-বাহিনীর মারের সঙ্গে শীতের মার যুক্ত হয়ে হিটলার-বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে দিয়েছিল, হিটলারকে চির-পরাজয়ের পথে যেতে বাধ্য করেছিল।

শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় বললেন, "হিটলার-নেপোলিয়নের কথা জানিনা, তবে স্বর্গত লালবাহাদুর শাস্ত্রীর কথা তো জানি। কিন্তু আর কথা নয়, এবার উঠে পড়ুন।"

প্রস্তুতি শুরু হলো মস্কো যাবার। একদিন আগে কলকাতা থেকে দিল্লী এসেছি। উঠেছি বন্ধুবর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে। শ্রীমতী গীতা মুখোপাধ্যায় প্রণব মুখোপাধ্যায়েরই সহধর্মিণী। ফোন বেজে উঠলো। সোমেন ফোন করছে। ডঃ সোমেন মুখোপাধ্যায় ও শ্রী শঙ্কর ঘোষ এবং আমি তিনজন

একসঙ্গে কলকাতা থেকে দিল্লী এসেছি। আমি ও শ্রী শঙ্কর ঘোষ রাশিয়া যাবো আর সোমেন যাবে জলন্ধর, একটা সামরিক ট্রেনিং-এ। সোমেন ফোন করে জানাল, শঙ্করবাবু প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছেন, বিমান-বন্দরে যাবার পথে আমি যেন তাঁকে তুলে নিই।

ইতিমধ্যে সোভিয়েত দূতাবাসের বিশিষ্ট সচিব মিঃ কুলাগুা এসে পড়লেন। সাতটা নাগাদ রওয়ানা হলাম। গাড়িতে আমি আর মিঃ কুলাগুা। শঙ্করবাবুকে তোলা হ'ল দিল্লীতে আনন্দবাজার পত্রিকার বাড়ি থেকে। সোমেন কম্বল মুড়ি দিয়ে আমাকে বিদায় জানাতে এসে দাঁড়িয়েছে গেটের কাছে। সোমেন আমাদের গাড়ি স্টার্ট দিচ্ছে দেখে বলল, "মুখেই টা টা বলছি, হাত নাড়তে পারলুম না। হাত কম্বলের মধ্যে।"

পালাম বিমান-বন্দরে পাসপোর্ট, ভিসা, বৈদেশিক মুদ্রাসংক্রান্ত কাজ শেষ করে বিশ্রাম-কক্ষে গিয়ে বসলাম। শঙ্করবাবু ঘোরাফেরা করছেন। তাঁর শীতও কম, উদ্‌বেগও কম। শঙ্করবাবু আগেও একবার সেভিয়েত ইউনিয়ন গেছেন—অন্য দেশ তো বটেই। তবে, তিনি স্বর্গত জওহরলাল নেহেরুর সঙ্গী হয়ে যখন গিয়েছিলেন তখন অবশ্য শীতকাল ছিল না। এটা আমার পক্ষে একটা সান্ত্বনা। শঙ্করবাবু কলকাতার একজন নাম-করা সাংবাদিক এবং প্রবীণও বটেন। সোভিয়েত ভ্রমণের আমন্ত্রণে আমাকে আর শঙ্করবাবুকে বাছাইয়ের কি যে মাপকাঠি ছিল এটা আজও আমার কাছে বিস্ময়ের। সোভিয়েত রাষ্ট্রের আমন্ত্রণ-লিপিটি হাতে পেয়ে সেদিনও ভেবেছিলাম, আজও ভাবি। আমন্ত্রিতের তালিকায় আমার নামটি যুক্ত হ'ল কি করে? ছোট্ট কাগজ, যদিও পদে বড়—তথাপি মস্কো পরিদর্শনের এই দুর্লভ আমন্ত্রণটি আমার কাছে আসা কিছুটা অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল।

বিমান-বন্দরে দেখা হলো বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা লোকসভার

সদস্য শ্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্তর সঙ্গে। শ্রীগুপ্ত কিউবায় যাচ্ছেন। মস্কো হয়ে যাবেন। সকাল ন'টায় যখন সোভিয়েত বিমানে উঠলাম, তখন ভারতীয় বলতে তিনজন। আমি, শঙ্করবাবু ও ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত। ন'টা বেজে কয়েক মিনিটে সুবিশাল সোভিয়েত বিমান আমাদের নিয়ে পালাম বিমান-বন্দর ছাড়লো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিমান মাটি ছেড়ে আকাশে উঠলো। দিল্লীর দৃশ্য ক্রমে অদৃশ্য হ'ল। যাত্রা শুরু হ'ল মস্কোর পথে। বিমান এগিয়ে চলেছে। হয়তো নীচুতে যে শহরটি দেখছি সেটি লাহোর। হয়তো পিণ্ডির গণ্ডিও ছাড়িয়ে গেছি। জানিনা, বিমানটা কাবুলের ওপর দিয়েও গেল কিনা। তবে মনে আঁকা মানচিত্রে মিলিয়ে নিলাম—পার হলাম লাহোর, পিণ্ডি, কাবুল। ঘণ্টা দুই চলবার পর শুরু হলো হিমালয় অতিক্রমণ। বিমান চলেছে অনেক উঁচু দিয়ে। নীচুতে দেখা যাচ্ছে হিমালয়ের শাখা-প্রশাখা ও শৃঙ্গসমূহ। কোথাও শৃঙ্গ আবলুস কাঠের মতো কালো, কোথাও মনে হচ্ছে শৃঙ্গটা বুঝি মগরার বালি দিয়ে ঢাকা, কোথাও ঢাকা সাদা বরফে। বেশীর ভাগ সময়ই বিমান চলেছে মেঘের অনেক উপর দিয়ে। তাই কিছুই দেখা যাচ্ছে না। একসময় দু'জন রুশ বিমান-বালা একটা ছোট্ট ট্রলিতে করে খাবার সাজিয়ে নিয়ে এগিয়ে এলেন। বিমান-টিতে শ'তিনেক আসন যেমন আছে, তেমনি দু'সারির আসনের মাঝ দিয়ে রাস্তাটা এমন, সেখানে দিব্যি সুন্দর ছোট্ট একখানা ট্রলি যেতে পারে। ট্রলিখানা এসে যাত্রীদের সামনে দাঁড়াচ্ছে, আর আসনের সামনে ভাঁজ করা টেবিলটা খুলে তার ওপর খাবার সাজিয়ে দিচ্ছে। দূর থেকে একটু আড়চোখে খাবারটা দেখে নিলাম। কারণ, খাবারের পরিমাণটা দেখে চোখ ছানাবড়া। যাহোক, আমার সামনে এলেই বুঝবো ব্যাপারটা কি। তারপর যখন আমার পালা এলো এবং বিমান-বালা প্লাস্টিকের ট্রে-তে খাবারগুলি সাজিয়ে

রাখলেন, তখন পদ দেখে মনে হলো, এযেন পুরাতন গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় জামাইষষ্ঠীর সেই জামাইয়ের সামনে সাজানো খাবারের ছবি। শুধু নেই ছবির সেই দৃশ্যটি, যেখানে শাশুড়ী ঠাকুরানী তালপাখায় হাওয়া করছেন; নববধূ দরজার একটা পাল্লা ফাঁক করে স্বামীর আদর-আপ্যায়ন উপভোগ করছেন আর শ্যালিকা "এটা খান", "ওটা খান" বলে নির্দেশ দিচ্ছেন।

বিমান যখন একটানা ছ'ঘণ্টা চলে মস্কোর আকাশে এলো তখন উপর থেকে যা দেখলাম, সে কুয়াশায় ঢাকা অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই নয়। এক সময় সেই কুয়াশা ও অন্ধকার ভেদ করে বিমান মস্কো বিমান-বন্দরের চত্বরে নামলো। কাঁচের ঘুলঘুলি দিয়ে যতদূর দেখা গেল, সে শুধু বরফ, বরফ, বরফ। বরফে ঢাকা প্রাসাদ-অট্টালিকা, গাছ, অন্য যা-কিছু চোখে পড়ে। মস্কোর ঘড়িতে এখন বেলা দেড়টা। আমাদের ঘড়িতে চারটে বেজে গেছে। ধীরে ধীরে বিমানের দরজা খুললো। যাত্রীরা নামছেন। আমরাও বিমান থেকে নামতে আসন ছেড়ে উঠলাম। পরনে ছিল দিল্লীরই পোশাক। শুধু উলের টুপিটা হাতে। বিমানের দোর-গোড়ায় আসতেই হাওয়া ও বরফ মুখে ঝাপ্‌টা মারলো। মনে হলো যেন কয়েক হাজার সূচ আমার চোখে-মুখে-মাথায় বিঁধে গেলো। তাড়াতাড়ি টুপিটা মাথায় পরে নিলাম। মাফলার দিয়ে জড়ালাম কান-মুখ। বিমান থেকে মাটিতে নেমে দেখি যেন ঝড় বইছে। শুধু ঝড় নয়; তার সঙ্গে আছে বৃষ্টি। বরফের বৃষ্টি। কোনক্রমে ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে বন্দরের লাউঞ্জে প্রবেশ করলাম। কিন্তু ততক্ষণে শরীর ভিজে গেছে। বিমান-বন্দরের প্রাথমিক কাজ ও পরীক্ষাদি শেষ হলে দোতলা থেকে একতলায় নামতেই একজন

তরুণ আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। প্রশ্ন করলো, "তোমরা কি মিঃ ঘোষ ও মিঃ রণেন ?"—আমাদের পরিচয় দিতেই সে তার নিজের পরিচয় দিলো। সে নভোস্তি প্রেসের কর্মচারী এবং নাম আনা-তোলে। নিজের নাম বলেই সে জড়িয়ে ধরলো আমাদের পরপর দুজনকে। বরফে ভেজা দেহকে আঁকড়ে ধরলো উষ্ণ আলিঙ্গনে। এমন ভাবে আমাদের মুখে তার মুখখানা চেপে ধরে ওষ্ঠ স্পর্শ করলো, যা আমাদের দেশে কল্পনাতীত। আমাদের নিয়ে একখানা গাড়ি রওয়ানা হলো মস্কো শহর মুখে। ফাঁকা রাস্তার দুইপাশে পাইন জাতীয় গাছ। তারপর শুরু হলো শহর। শহরে ঢোকার মুখেই চোখে পড়লো রাস্তার পাশেই একখানা মটর ভেঙ্গে পড়ে আছে। দেখেই বোঝা যায়—কোন দুর্ঘটনায় পতিত হয়েছিল গাড়িখানা। পরে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রান্ত ঘুরে সেখানকার যানবাহন চলাচল ও রাস্তা দেখে আমার প্রথম দেখা ভাঙ্গা মোটরখানি সম্পর্কে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করেছি, এদেশের রাস্তাতে মুখোমুখি সংঘর্ষ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা তো নেই বললেই চলে। কারণ, রাশিয়ার বড় বড় শহরগুলিতে তো বটেই অনেক ছোট শহরেও যে-সব রাস্তা আছে তার কাছে আমাদের কলকাতার সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউ বা চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ নিতান্তই গলি মনে হতে পারে। খুব কম রাস্তাই আছে, যেখানে যানবাহন একমুখো চলার নয়। রাস্তার মাঝখানে যে ব্যবধান থাকে তাতে আর যাই হোক, কোন গাড়িরই মুখোমুখি সংঘর্ষ সম্ভব নয়।

মস্কো শহরের মাঝখানে অতি অভিজাত হোটেল, "হোটেল সোভিয়েতস্কায়া" আমাদের বাসস্থান। তিনতলার একখানা বড় ঘরে আমাদের দুজনের ঠাঁই। জানলার মধ্যে দিয়ে শহর দেখা যাবে। ঘরের আসবাবপত্র দেখে মনে হয় আমাদের দেশের নবাবী আমলের আদব-কায়দার ছাপ। হোটেলের বাড়িটাও সম্ভবতঃ

পুরাতন কোন জমিদার জাতীয় লোকেরই হবে। রেডিও, টেলিফোন, টেলিভিশন থেকে শুরু করে জুতো পরিষ্কারের বুরুশ সাজানো আছে। হোটেলের ঘরে বসে মিঃ আনাতোলে প্রথমেই হুকুম দিল চায়ের। রুশ ভাষায় টেলিফোনে কি বললো জানি না, তবে আমাদের যখন জিজ্ঞাসা করলো, "চা, না কফি ?"—তখন বুঝলাম চায়েরই উদ্‌যোগ পর্ব চলছে। আমরা কফির প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করলাম। আর শঙ্করবাবু একটি কথা যুক্ত করলেন "গরু বা শুয়োরের মাংস যেন খাদ্যতালিকায় না থাকে।" আমাদের জন্যে কফির হুকুম দিয়ে আনাতোলে বেরিয়ে গেল। জানিয়ে গেল এক ঘণ্টার মধ্যেই সে ফিরে আসছে। যাবার সময় আনাতোলে আমাদের পাসপোর্ট ও বিমানের টিকিটটা চেয়ে নিল। কফির সরঞ্জাম নিয়ে একজন মহিলা একটা ছোট্ট গাড়ি ঠেলে ঘরে প্রবেশ করলেন। গাড়ির এক একটা তাকে সাজানো খাবার। সবার ওপরের তাকে কফি। মহিলা আমাদের দিকে তাকিয়ে অভিবাদন জানালেন। কফির কাপ-ডিশ্‌ সাজালেন। আবার একটু হেসে বেরিয়ে গেলেন। সম্ভবতঃ এই জাতীয় অতিথি অতীতেও তিনি কিছু দেখেছেন, যাদের সঙ্গে একটু হাসি বিনিময়ের অতিরিক্ত কিছু সম্ভব নয়। কারণ, তাঁর ভাষা এবং অতিথিদের ভাষার দুস্তর ফারাক। কাজেই কথা না বলে যা বলা যায়, সেটুকুই যথেষ্ট। রকমারি খাবারের মধ্যে পাঁউরুটিটাও রকমারি। একজাতের রুটি সাদা, একজাতের রুটি কালো। কালো রুটিগুলো ওজনে সাদা রুটির চেয়ে অনেক বেশী ভারী। সাম্যের দেশে রুটির বৈষম্য। প্রথমে ভেবেছিলাম, এ বৈষম্য বুঝি মূল্যভেদের। অর্থাৎ বেশী পয়সায় যারা কিন্‌বে, তারা কিনবে সাদা রুটি আর কম পয়সায় কিনবার জন্যেই বোধ হয় কালো রুটি। পরে ঠেকে শিখেছিলাম ও বুঝেছিলাম রুটির অবয়ব ও রঙের ফারাক বৈষম্যের প্রতীক নয়।

স্বাদ-বৈষম্যের জন্যে রুটির ব্যবহার হয়। অর্থাৎ বেশ কিছু খাবার আছে, যেগুলি সাদা রুটিতেই ভালো লাগে। আবার কিছু খাবার আছে যা কালো রুটিতে ছাড়া সাদা রুটিতে খেলে জোলো মনে হয়। আবার সকালে যখন কায়িক পরিশ্রম শুরুর আগে খাওয়া, তখন ভারী কালো রুটি খেয়ে নাও। আর রাত্রে যখন ঘণ্টা দুই-আড়াই ধরে নাচ-গানের মধ্যে দিয়ে খাওয়া, তখন সাদা রুটিটাই বেশী খাও।

খাদ্যদ্রব্য যা যা দিয়েছে, তার মধ্যে ফল, রুটি, কেক, এ ছাড়া অন্যগুলি কি ও কিসের তা বুঝতে পারছিলাম না। ভরসা, শঙ্করবাবু আছেন। তিনি এসব ব্যাপারে একটু বেশী ওয়াকিফহাল। অনেক জায়গায় দেখেছি শঙ্করবাবুও খাদ্য চিনতে এবং কোন্‌টা আগে খাবেন ঠিক করতে অথবা খাদ্য-তালিকা দেখে কোন্ খাদ্য চাইবেন বলতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছেন। অনেক সময় দুজনে মিলে ভেবে-চিন্তে ঠিক করলাম, খাদ্য-তালিকার এই খাদ্যটা নিশ্চয়ই এই জিনিস হবে। পরে যখন আমাদের হুকুমের খাবার টেবিলে এসেছে, তখন দেখেছি, চেয়েছিলাম জল, পেয়েছি বেল। একটা খাবারের দিকে নজর দিয়েই শঙ্করবাবু বিশেষ উল্লসিত হলেন। বললেন, "এটা হলো মাছের ডিম। খুব উপাদেয়; খেয়ে নিন। খুব ভালো লাগবে।" আমাদের খাওয়া শেষ হবার আগেই আনাতোলে এসে হাজির। সঙ্গে দুখানা টিকিট। ক্রেমলিনে "প্যালেস অব কংগ্রেসের" ব্যালের অনুষ্ঠান। ব্যালেতে যাওয়ার আগেই আনাতোলে আমাদের রুশ ভ্রমণের খসড়া কর্মসূচীটি বের করলেন। কবে, কোথায় আমরা যাবো, কি কি দেখবো; কোথায় কোথায় আমাদের নিয়ে সভা হবে, আলোচনা বৈঠক হবে ইত্যাদি। এই কর্মসূচীতে কোথাও রাশিয়ার বিক্ষুব্ধ লেখক বা অন্য কারও সাথে আমাদের দেখা-সাক্ষাতের সময় নির্দিষ্ট ছিল না। এখানে

বলে রাখা ভালো ১৯৭৩ সালের নভেম্বর মাস। যখন আমরা মস্কো যাই, তখন সোলঝেনিৎসিন ও সাখারোভকে নিয়ে বাইরের দুনিয়া বেশ সরগরম। আমাদের মস্কো যাওয়ার কথা শুনেই যে-সব বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে, তাঁরাই উপদেশ দিয়েছেন, "মস্কো যাচ্ছেন? সবচেয়ে আগে দেখা করবেন সোলঝেনিৎসিন-সাখারোভ এবং অন্যান্য যে-সব বিক্ষুব্ধ লেখক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক আছেন তাঁদের সঙ্গে।" অবশ্য সেই সঙ্গে অনেক সব-জান্তা বন্ধু এ-কথাও বলেছিলেন, "মশাই, রাশিয়া যাচ্ছেন, আপনাদের কি খুশিমতো কিছু দেখতে দেবে বা স্বাধীনমতো কারো সাথে কথা বলতে দেবে?" যাহোক, এমনিভাবে আরও অনেক কথাই অনেকে বলেছেন। তবে সকলেরই আগ্রহ ছিলো আমরা যেন সোলঝেনিৎসিন-সাখারোভ সহ বিক্ষুব্ধদের ব্যাপারটা ভালো করে বুঝে আসি। মুক্ত দুনিয়ার প্রবক্তারা বেশ কিছুদিন ধরেই সোলঝেনিৎসিন ও সাখারোভের ছবি ছাপিয়ে প্রচার করছিলেন, সোভিয়েত দেশে কোনও প্রকার গণতন্ত্র নেই। গণতান্ত্রিক জনমতের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। মানবাধিকার সেখানে লাঞ্ছিত। সোলঝেনিৎসিন স্তালিন আমলে বহুদিন বন্দী-শিবিরে বন্দী-জীবন যাপন করেছেন। তাঁর সেই বন্দী-জীবনের অভিজ্ঞতা ইভান দেনিসোভিচের জীবনে একদিন গ্রন্থে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই গ্রন্থ সোভিয়েত রাশিয়াতেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু এর পরেই সোলঝেনিৎসিন যা লিখেছেন, তা প্রকাশিত হয়েছে পশ্চিমী দুনিয়ায়। অবশেষে নোবেল পুরস্কারও পেয়েছেন সোলঝেনিৎসিন। সোলঝেনিৎসিনের সর্বশেষ গ্রন্থখানিও সারা বিশ্বে সোভিয়েত-বিরোধী আসরে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই গ্রন্থ হলো "গুলাগ আর্কিপেলেগো" ১৯১৮—১৯৫৬। এই

গ্রন্থ যখন প্রকাশের মুখে এবং সোলঝেনিৎসিনকে নিয়ে যখন আলোড়ন তুঙ্গে, তখনই আমরা মস্কো শহরে। সোলঝেনিৎসিনের নামে তখন অনেক খবরই আমাদের দেশে নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এ-ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী সংবাদ, নিবন্ধ, বিশেষ নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে আনন্দবাজার, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকাতে। সেই পত্রিকারই একজন শীর্ষ সাংবাদিক যখন রাশিয়া যাচ্ছেন তখন সোলঝেনিৎসিন-সাখারোভ সম্পর্কে যথেষ্ট খোঁজ-খবর নেওয়া হবে এতে আর সন্দেহ কি? প্রকৃতপক্ষে সোলঝেনিৎসিনও এই সময় প্রায় বেপরোয়াভাবে মুক্তকণ্ঠে নিজের দেশ সম্পর্কে কথাবার্তা পশ্চিমী সাংবাদিকদের বলছিলেন। সে সব কথাবার্তা এবং সংবাদও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছিলো। রাশিয়ায় গণতন্ত্র নেই বলে পশ্চিমী ছুনিয়ার সাংবাদিকদের কাছে সোলঝেনিৎসিন নামে যে বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিটি রাশিয়ায় বসেই ঘোষণা করবার সুযোগ পেয়েছেন, সেই সোলঝেনিৎসিনকে রাশিয়ায় এসে না দেখে ফিরে যাওয়ার কোনও অর্থই হয় না। প্রকৃতপক্ষে আনাতোলের আনা টাইপ-করা আমাদের সফর-সূচীর মধ্যে একটি বিষয় আবশ্যিক করবার কথা বললাম, সেটি হলো, আমরা যে প্রদেশেই যাইনা কেন, সেখানে বিক্ষুব্ধ লেখকদের সঙ্গে দেখা করবোই। আর মস্কো শহরে ক্রেমলিন না দেখি, লেনিন স্মৃতিসৌধ না দেখি ক্ষতি নেই; কিন্তু সোলঝেনিৎসিন-সাখারোভকে দেখা চাই-ই চাই। আমার এখনও আনাতোলের মুখখানা চোখের ওপর ভাসছে। আমরা মাননীয় অতিথি। আমাদের কথা বিনম্র ভাবে শোনা তার কর্তব্যের মধ্যে। আমরা যতক্ষণ সোলঝেনিৎসিন-সাখারোভের কথা বলছিলাম, তাঁদের সঙ্গে দেখা করবার ওপর গুরুত্ব আরোপ করছিলাম, আনাতোলের মুখখানা ততই বোকাবোকা হয়ে উঠছিল। আনাতোলের ভাবান্তরকে তখন নিজেদের কৃতিত্বের

ফল বলেই মনে করছিলাম। নিজেদের নিজেরাই তারিফ করে ভাবছিলাম, এবার বোঝ মজা, তোমরা ভেবেছ আমাদের চার্টে উন্নয়ন পরিকল্পনা আর মিউজিয়াম দেখিয়ে রেহাই পাবে। তা হচ্ছে না! আমরা সোলঝেনিৎসিন-সাখারোভের সঙ্গে দেখা করবোই। আনাতোলে আমাদের সব কথাবার্তা হওয়ার পর জানালো, আমরা যে-সব প্রজাতন্ত্রে যাবো, সেখানে সেখানকার লেখক সমিতি, সাংবাদিক ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে আমাদের বৈঠকের কর্মসূচী ঠিক করাই আছে। আর সাখারোভ-সোলঝেনিৎসিনের সঙ্গে দেখা যদি করতে হয় তবে বিভিন্ন প্রজাতন্ত্র ঘুরে এসে আবার যখন মস্কো আসবো তখন দেখা হবে। সেই সঙ্গে আনাতোলে আরও বিনয়ের সঙ্গে বললো, সমগ্র কর্মসূচীটি অনেক দিন আগে থেকেই তৈরী হয়েছে, কাজেই এর কোনও এদিক-ওদিক করতে হলে একটু সময় লাগবে। আপনাদের যখন সোলঝেনিৎসিন-সাখারোভের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা, সেটা আপনারা স্বাধীন ভাবেই করতে পারবেন, তার জন্যে আমাদের সাহায্য না হলেও চলবে। আপনারা যখনই প্রয়োজন হবে, তখনই বেরিয়ে পড়বেন। আনাতোলের এই কথাগুলো সেই মুহূর্তে বেশ অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। কারণ, রাশিয়া সম্পর্কে অন্য অনেক কথার মধ্যে এটাও শুনে এসেছি, এটা লৌহ যবনিকার দেশ। রাশিয়া এসে আমরা স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াবো, স্বাধীনভাবে মেলামেশা করবো, স্বাধীনভাবে লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলবো, একি সম্ভব? নিজেদের খুব বুদ্ধিমান মনে করে এমন আলোচনাও না করেছি তা নয় যে, আমরা হোটেলের যে ঘরে আছি, সেখানে হয়তো টেপরেকর্ডার ফিট করা আছে। আমরা যা-কথাবার্তা বলছি, সেটা নিশ্চয়ই টেপ্ হয়ে যাচ্ছে। তাই আনাতোলে যখন বললো সোলঝেনিৎসিনের সঙ্গে দেখা করতে কারও সাহায্যের প্রয়োজন নেই, যে

কেউ তাঁর বাড়ি গিয়ে দেখা করতে পারবেন, তখন কথাটা শুনে বিশ্বাস তো করিইনি, বরং উলটো কথাই চিন্তা করেছি। যা হোক সময় হয়ে গেল ব্যালে দেখতে যাওয়ার। রওয়ানা হলাম ক্রেমলিনে। ক্রেমলিনে কংগ্রেস-ভবনে এই ব্যালে হবে।

ট্রইট্স্কি-টাওয়ারের ঠিক দক্ষিণেই সেই বিখ্যাত কংগ্রেস-ভবন। একবার দৃষ্টিপাত করলে আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না। শ্বেত পাথর আর কাচের অদ্ভুত সমন্বয়ে তা যেন সর্বদাই উৎসবের সাজে সজ্জিত। এর বহিরঙ্গের সৌন্দর্যের সঙ্গে একমাত্র তুলনা করা চলে ক্রেমলিনের মিনারটির।

কিন্তু কেবলমাত্র বাইরের সৌন্দর্যই নয়, এই কংগ্রেস-ভবনটিতে অনুষ্ঠিত হয় নানা সভা-সমিতি, অধিবেশন, এমন কি ব্যালে-নাচ পর্যন্ত। কারণটি হল এর বিশালতা। কংগ্রেস-ভবনটির অডিটোরিয়াম ১৬৫ ফুট গভীর, ১১৫ ফুট প্রশস্ত এবং উচ্চতা ৬৬ ফুট। ছ'হাজার মানুষের বসবার আসন আছে একই সঙ্গে। এর ভেতরের সাজসজ্জাও দেখবার মতো—অত্যন্ত সাদাসিধে, স্নিগ্ধ। বসবার চেয়ারগুলো যেভাবে সাজানো রয়েছে, ঠিক তারই অনুকরণে ওপরে সিলিং-এ ঝক্‌ঝকে সাদা অ্যালুমিনিয়ামের ব্যাণ্ড দিয়ে বর্ডার করা। আর সেই ব্যাণ্ডের আড়ালে লুকিয়ে থেকে স্নিগ্ধ আলো বিকিরণ করছে ৪,৫০০টি ল্যাম্প।

এটি বলশয় থিয়েটার হলের থেকে প্রায় দেড়গুণ বড়। এখানে একই সঙ্গে একটি বক্তৃতাকে ২৯ রকম ভাষায় অনুবাদ করবার সুবন্দোবস্ত আছে। অডিটোরিয়ামের উপরে রয়েছে একটি ব্যাঙ্কোয়েট হল, যেখানে একসঙ্গে ২,৫০০ জন মানুষ বসতে পারে। এটিও একটি অপূর্ব জিনিস। কারণ স্প্রিং-এর সাহায্যে এটিকে এমন ভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে যখন যেমন খুশী ব্যবহার করা

যায়। অথচ এতটুকু শব্দ পর্যন্ত হয় না। সত্যিই, মনোমুগ্ধকর এমন সুন্দর ব্যবস্থার পরিকল্পনাটি ভাবলেও বিস্মিত হতে হয়। যে-কোন একটি চেয়ারে বসলেই আপনার সামনে কোন-না-কোন একটি জানলা পড়বেই। আর তাই দিয়ে বাইরে দৃষ্টিপাত করলেই দেখবেন মস্কো আর প্রাচীন ক্রেমলিনের অপূর্ব দৃশ্য।

আমি আসনে বসে মঞ্চের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলুম এই মঞ্চ, এই পর্দা, এই হলের ছবি কতভাবে দেখেছি। এই মঞ্চের ওপর বসেই বিশ্বশান্তি আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন বিশ্বকে সুখী সমৃদ্ধিশালী করে গড়ে তুলতে। বিশ্ব থেকে যুদ্ধবাজদের নির্মূল করার অভিযানকে সফল করতে। বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের মূল-ধারা প্রবাহিত হয় এই মঞ্চের উৎসমূল থেকে। সি-পি-এস-ইউ-এর বৈঠক বসে এই হলে, রাশিয়ায় যে-সকল বিশ্ব-প্রধান আসেন তাঁদের সম্বর্ধনা জানানো হয় এই মঞ্চে, মহাকাশ-বিজয়ী বীরদের এই মঞ্চেই সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল—সে ছবিটি এখনও চোখের উপর ভাসছে।

এক সময় ঘণ্টা বাজল। অনুষ্ঠান শুরু হবে। মঞ্চের দিকে তাকিয়ে আছি। আলোটা একটু ম্লান হ'ল, দেখলাম দর্শকদের আসন ও মঞ্চের মধ্যে যে অন্ধকার জায়গাটি ছিল, সেখানে আর একটি ছোটখাটো মঞ্চ ধীরে ধীরে উঁচুতে উঠছে। পাতাল থেকে একটি মঞ্চ মূল-মঞ্চের সমান্তরাল হ'ল। সেই দৃশ্যের বর্ণনা দেওয়া মুশকিল। মঞ্চের উপরে টুলে বসে বাদকরা। ছড়ি হাতে সামনে দাঁড়ানো মূল-বাদক। নিঃশব্দ পরিবেশ। কতজন বাদক বাদ্যযন্ত্র হাতে বসে আছেন সেটা অনেকবার গণনার চেষ্টা করলাম কিন্তু যে-কোন সারির একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত গণনা করা অসম্ভব। কারণ, যে-মানুষগুলি বসে আছে, ছেলে এবং মেয়ে, তাদের পোশাক এক, হাতের যন্ত্রও এক। অর্থাৎ, একটা সারিতে

যদি দু'শজন থেকে থাকেন, তবে সেই দু'শজনের হাতেই গীটার বা বেহালা। কাজেই কিছুদূর গণনার পরেই আপনার গুলিয়ে যাবেই। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের দেশের যে-কোন একটা হলের দর্শকসংখ্যা যত এখানে বাদকের সংখ্যা প্রায় তত।

অনুষ্ঠান শুরু হ'ল। অনুষ্ঠান নাচ ও গানের। নাচ একক ও সমবেত। গান একক। এক একটি গান ও নাচ শেষ হবার পর ঘোষক মঞ্চে আসেন পরবর্তী অনুষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের শিল্পীর নাম ঘোষণা করেন। দেখছিলাম, এক একটি নাম ঘোষণায় দর্শকদের মধ্যে ভিন্ন রকম প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল। কোনও কোনও শিল্পীর নাম ঘোষণায় করতালিতে সমস্ত হল মুখরিত হয়ে উঠছিল। অনুমান করছিলাম শিল্পীর জনপ্রিয়তা এই করতালির মধ্যে দিয়েই। শিল্পীর অনুষ্ঠান শেষ হতেই পশ্চাৎপট ও সামনের পর্দার পরিবর্তন হয়ে যায়। মোট পর্দার সংখ্যা সাত। অনুষ্ঠানে গানের সুর এবং নাচের মধ্যে দিয়ে উপস্থাপিত কাহিনী ছাড়া আর কিছুই আমাদের বোধগম্য হচ্ছিল না। আর কিছু কিছু সুর যা আপন মহিমাতে হৃদয়ে অনুভূতি সৃষ্টি করে; যার জন্যে ভাষার কোনও প্রয়োজন হয় না। কিছুই বুঝছিনা, শুধু সুরের মূর্ছনায় বুকের মধ্যে ব্যথা অনুভব করছি, কাহিনী বুঝছিনা, কিন্তু নৃত্যের ভঙ্গিমায় করুণ মানসিকতার সৃষ্টি হচ্ছে। তাই অনেক গানের সুর নৃত্যের ছন্দ ভাষার বাধাকে অতিক্রম করে আমাদের হৃদয়ে নতুন নতুন অনুভূতির সৃষ্টি করছিল।

দর্শকদের চরিত্রের সঙ্গে দেখলাম আমাদের বেশকিছু মিল। অনুষ্ঠানকে তারিফ করবার জন্য বেশ উৎসাহ। দর্শকদের মধ্যে আমার সামনেই একটি ছেলে ও একটি মেয়ে সারাক্ষণ গল্প করছিলো, নিজেদের মধ্যে। মঞ্চের দিকে তাদের চোখ খুব সামান্য সময়ের জন্যেই দিয়েছে। তাদের জীবনের কত জটিল সমস্যা যে আছে জানিনা, কিন্তু সমস্ত সময় দুজনে বসে সেই সমস্যার গিঁট খুলছিলো,

এটা তাদের মুখ-ভঙ্গী, হাত-নাড়া এবং চোখের চাহনির, মধ্যে দিয়েই বুঝতে পারছিলাম। ছেলেটি মাঝে মাঝে একটু বেশী উচ্ছল হয়ে উঠছিলো। মেয়েটি কখনও প্রশ্রয় দিয়ে কখনও কৃত্রিম কঠোরতা দেখিয়ে নিবৃত্ত করছিলো। আমার ঠিক পাশেই দুটি মেয়ে বসেছিলো। তাদেরও দেখলাম, সারাক্ষণ চোখ আটকে আছে ছেলে-মেয়ে দুটির দিকে। ওদের ভাব-ভঙ্গী-আচরণ দেখে নিজেরাও আলোচনা করছিলো। এক সময় ছেলেটি আসন থেকে উঠে বাইরে গেলো। তখন দেখলাম, আমার-পাশে-বসা দুটি মেয়ের একটি মেয়ে সামনে-বসা মেয়েটির কাছে গিয়ে হাত-মুখ নেড়ে অনেককিছু বলে এলো। ছেলেটি ফিরে আসতেই আসন-থেকে-উঠে-যাওয়া মেয়েটি নিজের আসনে ফিরে এসে বসলো। মুখ ফিরিয়ে রাখলো অন্য দিকে। যেন ওরা কেউ কাউকে চেনে না। বুঝলাম, এই তিনটি মেয়েই পরস্পর পরস্পরের বান্ধবী। সমস্ত দৃশ্যটি আমার কাছে খুব ভালো লাগলো এই কারণে যে, রাশিয়ার ছেলেমেয়েরাও রক্ত-মাংসের মানুষ; সুকুমার বৃত্তি ও মননে রাশিয়ার ছেলে-মেয়ে ও ভারতীয়দের মধ্যে সম্ভবতঃ কোনও তফাত নেই। সেটা পরে আরও অনুভব করেছি। অনুষ্ঠানের সাময়িক বিরতি ঘটলো। আসন ছেড়ে দর্শকরা রওয়ানা হ'ল বাইরের দিকে। আনাতোলে বললে, চলুন আমরা চা খেয়ে আসি। আমরা আসন ছেড়ে রেস্তোরাঁ মুখে চললাম। রেস্তোরাঁয় আমাদের একটা টেবিলে বসিয়ে আনাতোলে নিজেই খাবার আনতে গেলো। ডিশ্-ভৈরতি নানা রকম কেক, পেস্ট্রি রেখে জিজ্ঞাসা করলো পানীয় কি আনবে? শঙ্করবাবু আনাতোলাকে বললেন, কোন প্রকার মদ্য নয়। নরম পানীয় কিছু চলতে পারে। কিছুক্ষণ পরে তিনটি বোতল আমাদের টেবিলের উপর এনে রাখলো। আনাতোলে আগেই খেতে আরম্ভ করেছে। শঙ্করবাবুও খেতে শুরু করলেন। আমিও ভরসা পেয়ে গ্লাসে পানীয় ঢাললাম।

পানীয়টি দেখতে অনেকটা আমাদের দেশের কোকা-কোলার মতো। বেশকিছুটা খেয়ে গলায় মৃদু ভিন্ন-অনুভূতি অনুভব করলাম। কেমন যেন স্পীরিটের গন্ধ। পানীয় যখন শেষ হবার মুখে তখন খুব আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলাম, যে-বস্তুটি গলাধঃকরণ করছি, এটা কি মদ জাতীয় কিছু?" আনাতোলে প্রবলভাবে মাথা নেড়ে জবাব দিলো "না, না, এটা মদ হবে কেন? এটা হলো কনিয়াক।" শঙ্করবাবু আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন; আমিও বুঝলাম, যার নাম চালভাজা, তার নামই মুড়ি। রাশিয়াতে জল যে একটা পানীয় এটা কেউ জানেও না, তা কেউ খায়ও না। জলের প্রয়োজনে যা ব্যবহার করা হয়, সেটা হলো "মিনারেল ওয়াটার"। অর্থাৎ "সোডা ওয়াটার" জাতীয় জল। আর ব্যবহার করা হয় ভদকা। আমরা হালে গঙ্গাতীরবাসী, মূলে মধুমতীর চরের লোক; জল ছাড়া প্রাণ বাঁচে এতো কল্পনার বাইরে। খেতে বসে থালার পাশে, হোক না কাঁসার থালা না হয়ে চীনামাটির ডিশ্; কিন্তু এক গ্লাস জল থাকবেনা, একি কল্পনা করা যায়? রাশিয়ার মানুষের গলা ভিজাবার প্রয়োজন হলে ভদকা আছে, কোনিয়াক আছে, আছে আরো কতো বাহারী নামের মদ্য। কলের জল, নদীর জলের তো কথাই ওঠে না। সেটা নিতান্ত প্রক্ষালনের অতিরিক্ত কোনও প্রয়োজনে লাগে, এটা কেউ জানে বলে জানিনা, বা জানে এমন কারও সঙ্গে হৃদ্যতা হয়নি। আমরা কিন্তু জলের ব্যবস্থা খাওয়ার টেবিলে না হোক, ঘরে নিজেদের মতো করে নিয়েছিলাম। হোটেলের ঘরে গরম ও ঠাণ্ডা জল দু'রকমই আছে। ঠাণ্ডা জলটা নয়, গরম জলটা গ্লাসে রেখে দিতাম এবং সেই জল পানীয় হিসাবে নিয়মিত ব্যবহার করতাম। যা হোক, কোনিয়াকের কথায় ফিরে আসি। কোনিয়াক অবশ্য আর খাইনি, তবে কোনিয়াক যে কি মহামূল্যবান বস্তু সেটা অনুভব করেছিলাম, আর্মেনিয়া গিয়ে একটি

কোনিয়াকের কারখানায় মহান গোর্কীর একটি লেখা দেখে। আর্মেনিয়াতে ইরেভান শহরের অদূরে বিরাট কোনিয়াক কারখানা। একদা ম্যাক্সিম গোর্কী এই কারখানা পরিদর্শনে এসেছিলেন। কারখানা পরিদর্শনে এসে গোর্কীকে ভূ-গর্ভস্থ কোনিয়াক মজুত-ভাণ্ডারে নিয়ে যাওয়া হয়। কোনিয়াকের ড্রাম ও বোতলগুলির পাশে পাশে ঘুরে বেড়ান গোর্কী, তারপর এক সময় তাঁকে সেখান থেকে উঠে আসতে বলা হয়। গোর্কী তখন বলেন, "ওগো তোমরা কি নিষ্ঠুর, তোমরা কেন আমাকে এইখানে সমস্ত জীবন থাকতে দিচ্ছ না।" গোর্কীর এই কথাকয়টি ইরেভান কোনিয়াক কারখানায় প্রস্তর ফলকে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে।

রেস্তোরাঁ থেকে ফিরে এসে আবার আসনে বসলাম, শো শুরু হলো। ঘণ্টাখানেক অনেকগুলি অনুষ্ঠানেব মধ্যে দিয়ে শেষ হলো ব্যালে নাচ-গানের আসর। হোটেলে ফিরে এলাম। রুশ-ঘড়িতে প্রায় রাত ন'টা বাজে। আনাতোলে বললো, "চলুন, আমরা রেস্তোরাঁয় গিয়ে আমাদের নৈশ আহার সেরে আসি।" পোশাকের সামান্য পরিবর্তন করে রেস্তোরাঁয় গিয়ে একটি টেবিল ঘিরে আমরা তিনজন বসলাম। আদেশ মতো খাবার আসতে শুরু করলো। রেস্তোরাঁর দিকে চোখ বুলিয়ে নিলাম। কয়েকশ' টেবিল ঘিরে বসে আছে, পুরুষ-মহিলা-শিশু। সামনে একটা ছোট মঞ্চ। মঞ্চের দেওয়ালে লেনিনের একখানা ছবি। মঞ্চের আশে-পাশে নানা রকমের বাদ্যযন্ত্র সাজানো রয়েছে। বাদকরাও এসে একে একে যন্ত্রগুলি নিয়ে রেওয়াজ শুরু করলেন। এরপর সামান্য বিরতিতে মঞ্চে কালো-পোশাকে ঢাকা একজন মহিলা শিল্পী এসে দাঁড়ালেন। শিল্পী মঞ্চে আসতেই সারা হলে প্রায় মিনিট খানেক ধরে হাত-তালি পড়লো। দু'তিনখানা গান গাইবার পর শুরু হলো বাজনার আসর। বাজনা শুরু হতেই আহার বন্ধ হয়ে গেল।
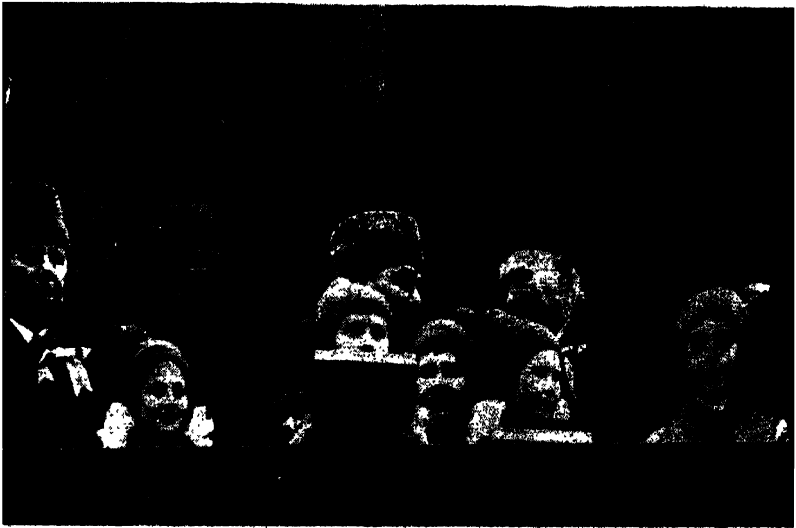
উপরে (বাম থেকে দক্ষিণে) শিশুদের সঙ্গে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ: পোদগর্নি, ব্রেজনেভ, কসিগিন ও সুসলভ

সাইবেরিয়ায় একটি নতুন জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র
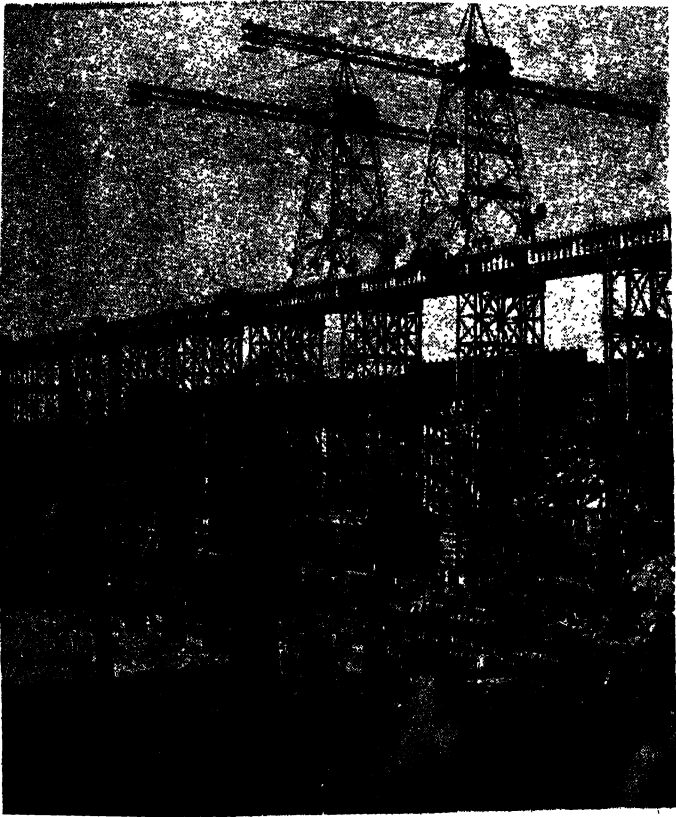
প্রায় সকলেই টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর এক একজন পুরুষ, একজন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে নাচতে শুরু করলেন। পুরুষরা যে-কোনও টেবিলে গিয়ে যে-কোনও মহিলার সামনে দাঁড়াচ্ছেন, মহিলা টেবিল ছেড়ে উঠে আসছেন। তারপর হাতে হাত মিলিয়ে বাজনার তালে নাচছে। সারা হলের মানুষগুলো জোড়ায় জোড়ায় নাচছে। কয়েকজন মাত্র ব্যতিক্রম। যার মধ্যে আমরা তিনজন। এ-নাচের দৃশ্য আমাদের চোখে সামান্য পীড়া দিলেও রুশীয়দের মধ্যে বিন্দুমাত্র দ্বিধা ও সংকোচ সৃষ্টি করে না। মুখে মুখে মিলিয়ে কপোলে ওষ্ঠ রেখে অথবা দু'বাহুতে কণ্ঠ জড়িয়ে ঠোঁটে ঠোঁট মিলিয়ে এ-নাচ চলছে তো চলছেই। বাজনা চলছে তো চলছেই। এক সময় বাজনার বিরতি ঘটলো। নাচের শেষ হলো। জোড়ের বন্ধন খুলে আবার যে যার আসন নিল। শুরু হলো খানাপিনা। মিনিট দশ বিরতিতে আবার বাজনা শুরু হলো। আবার জোড়ায় জোড়ায় নাচ। এক সময় এক মহিলার নজর পড়লো আমাদের টেবিলের দিকে। মহিলা ধীর পদে আমাদের টেবিলের দিকে এগিয়ে আসছেন। বুঝতে পারছি, আমাদের পালা। প্রথমবার ফাঁড়া কেটে গেলো। আনাতোলে উঠে গিয়ে মহিলার হাত ধরলেন। আমি আর শঙ্কর বাবু হাফ্ ছেড়ে বাঁচলাম। কিন্তু না, আর একজন এগিয়ে আসছেন। অসাধারণ সুন্দরী মহিলা ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এসে আমাদের টেবিলের সামনে দাঁড়ালেন। আমি আহারের দিকে একটু বেশী মনোযোগ দিলাম। ভাবলুম, যদি শঙ্করবাবুর ওপর দিয়েই ঝক্কিটা কেটে যায়। ভদ্রমহিলা আমাদের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে প্রথমে একটু হাসলেন, তারপর রুশভাষায় কি বললেন, সেটা বোঝার প্রশ্নই ওঠে না। তারপর ভদ্রমহিলা হাত চেপে ধরলেন শঙ্করবাবুর। শঙ্করবাবু জানেন, ইংরেজী

ভাষায় কথা বলে এঁদের কাছে কোনও লাভ নেই। তবু বলে চলেছেন, “নো, নো, নো।” লক্ষ্য করে দেখলাম, যাঁরা টেবিলে বসে আছেন তাঁরা আমাদের দেখছেন; যাঁরা নাচছেন তাঁরাও নাচের ফাঁকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছেন। এর পরের দৃশ্য এবং ঘটনা আরও রোমাঞ্চকর। অনেক দূরে বসা এক তন্বী তরুণী এগিয়ে আসছেন আমাদের টেবিলের দিকে, আমার দিকে, চোখে-মুখে দুষ্টুমীর হাসি; বুঝলাম, দু'জন বিদেশী অতিথি তাঁদের নাচ-গান খানা-পিনার আসরে বেশ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে আনাতোলে আমাদের অবস্থা বুঝে নাচের গিট খুলে টেবিলের সামনে এলো। মহিলা দু'জনকে রুশ ভাষায় কি বললো, মহিলা দু'জনও তার জবাব দিলেন। এরপর আনাতোলে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললো, “আফটার অল, উওম্যান ইজ উওম্যান।” অর্থাৎ মহিলাদের দাবি পূরণ করো। আমার তখন শুধু একটি কথাই বলতে ইচ্ছে করছিলো “ব্রুটাস্, তুমিও?”

ঘরে ফিরে দেখি প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রী ননী ভৌমিক এসে বসে আছেন। শ্রীভৌমিক মস্কোতে প্রগতি প্রকাশনে চাকরি করেন। আমাদের উভয়ের সঙ্গেই শ্রীভৌমিকের পূর্ব পরিচয় ছিল। শুরু হ'ল খোশ গল্প। তিন বাঙালী প্রাণ খুলে বাংলায় কথা বলছি। আমরা জেনে নিচ্ছি রুশ দেশ সম্পর্কে নানা কথা। ননীবাবু জেনে নিচ্ছেন কলকাতা সম্পর্কে খোঁজ-খবর, বন্ধু-বান্ধবদের অবস্থা, পরিস্থিতি ইত্যাদি ইত্যাদি। সবেমাত্র ব্যালে এবং থিয়েটর দেখে এসেছি। হোটেলেও নাচ-গান কিছু দেখলাম। তাই ননীবাবুর সঙ্গে বসলাম রাশিয়ার নাটক-গান-নাচ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে। আমি নিজে একদা নাটক লিখতাম। হাফ-পেশাদার হয়ে অভিনয়ও করেছি। বিশ্ব যুব উৎসব উপলক্ষ্যে নাটক প্রতিযোগিতায় রাশিয়া

থেকেই পদক ও অভিজ্ঞানপত্র পেয়েছি। যাহোক, সব মিলিয়ে নাটক সম্পর্কে একটু কৌতূহল বেশীই ছিল। তাই ননীবাবুর সাথে নাটক নিয়েই প্রথমে একটু আলোচনা শুরু করলাম। শুনলাম রাশিয়ার নাটকের কথা। পরে রাশিয়ার অন্যান্য প্রদেশ যখন ঘুরেছি তখনও নাটক নিয়ে, নাট্য আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করেছি। বুঝবার চেষ্টা করেছি আমাদের দেশের নাট্য আন্দোলন আর রাশিয়ার নাট্য আন্দোলনের মধ্যে তফাৎ কতোটা। বুঝবার চেষ্টা করেছি আমাদের দেশের নাট্যশিল্পী, অভিনেতা ও নাট্যমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের সঙ্গে রাশিয়ার তফাৎ কতোটা।

১৯১৭ সালের ২৫শে অক্টোবর অর্থাৎ যেদিন, রুশ ইতিহাসের মোড় ঘোরে, সেদিনও পর্যন্ত নাট্যকলা এক শোচনীয় অধোগতির দিকে ছিলো। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব রাশিয়ায় এক নতুন সামাজিক দৃষ্টি এনে দেয় ও সৎ নাট্যকর্মীদের সামনে জনসেবার এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। থিয়েটারকে আর একমাত্র প্রমোদের মাধ্যম ভাবা হয়না, নতুন সরকারের প্রত্যয় জন্মে যে, বৈপ্লবিক ন্যায়পরায়ণতার ভাবধারা অনুশীলনের এটি একটি সবল বাহন। ১৯১৯ সালে নাট্য সংস্থাগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে এক ডিক্রী জারী করে সমস্ত থিয়েটারকে সরকারী সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়। সাংস্কৃতিক অগ্রগতির ক্ষেত্র— থিয়েটারকে একটি শক্তিশালী উপাদান রূপে গণ্য করা হয় এবং রাষ্ট্র থিয়েটারকে প্রাথমিক প্রয়োজনের তালিকায় আনে। জন্মকাল থেকেই সোভিয়েত থিয়েটারগুলি জনসেবা করে আসছে। সোভিয়েত থিয়েটার সোভিয়েত জনসাধারণের স্বার্থ, সমস্যা, সাফল্য সহ জীবন এবং অতীত ও বর্তমানের স্পষ্ট পার্থক্যকে বিভিন্ন নাটকের

মধ্যে দিয়ে বিধৃত করেছে। অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ের মধ্যে অ-রুশীয় প্রজাতন্ত্রগুলি স্থায়ী নাট্য ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে এবং এমন সব চমৎকার অভিনেতা ও পরিচালককে শিক্ষিত করে তুলেছে, যাঁরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েত কলার প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম।

সোভিয়েত ইউনিয়নে ১ লক্ষ ৫০ হাজারের উপর সিনেমা ইউনিট আছে, তার ৮৫ শতাংশই হলো গ্রামাঞ্চলে। বর্তমানে ৯০০০ বৃহৎ পর্দা সমন্বিত, ৬০টি প্রশস্ত আকারের, এবং ১৫টি প্যানোরামিক সিনেমা থিয়েটার আছে। অধিকাংশ আধুনিক থিয়েটারই সাধারণ পর্দা ও বিস্তীর্ণ উভয় রকমের পর্দাতেই চলে। এদেশের বৃহত্তম সিমেমা ও থিয়েটার হল হ'ল মস্কোর ক্রেমলিন প্রাসাদের "প্যালেস অব কংগ্রেস"; যেখানে আমি প্রথমেই ব্যালে নাচ দেখতে গিয়েছিলাম।

যুদ্ধের সময় প্রভূত প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সোভিয়েত থিয়েটার-গুলি জাতির জীবনকে প্রতিফলিত করেছে। শান্তির সময় থিয়েটারগুলি সমাজতান্ত্রিক গঠন কার্যে সাহায্য করে। যুদ্ধের সময় থিয়েটারের অভিনেতৃবৃন্দ ও পরিচালকবর্গ সামরিক পরিচ্ছদ পরে যোগ দেন গিয়ে যোদ্ধাদের সঙ্গে। যেমনি পশ্চাদপসরণের বেদনা-দায়ক দিনগুলিতে, তেমনি সামরিক জয়ের দিনগুলিতে হাজার হাজার নাট্যদল ভোল্‌গা থেকে বার্লিন পর্যন্ত পর্যটন করে সৈন্যদের জন্যে নাট্য-পরিবেশন করে। তাঁদের মঞ্চ ছিল পরিখায়, ট্রাকের উপর অথবা একেবারে রণক্ষেত্রে। জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে সোভিয়েত আর্ট সংগ্রাম করে, তাদের মধ্যে আনে শত্রুর প্রতি ঘৃণা আর জাগায় দেশপ্রেম। একেবারে রণাঙ্গনের মধ্যেই বহু নাট্যা-ভিনয় ও কন্‌সার্ট পরিবেশিত হয়, অনেক অভিনেতা সৈনিক হয়ে যুদ্ধ করেন। যাঁরা যুদ্ধের সময় তাঁদের শিল্পকে হাতিয়ার মনে করে

রণাঙ্গনে গিয়ে আর ফেরেন নি, থিয়েটারগুলিতে তাঁদের নাম মর্মর ফলকে খোদিত আছে।

১১ই নভেম্বর সকাল হতেই আমরা তৈরী হয়ে নিলাম দূর যাত্রার প্রস্তুতিতে। আমরা যাবো ঋষি তলস্তয়-এর জন্মভূমি, কর্মকেন্দ্র, সাধনার স্থল—ইয়াসনাইয়া পলিয়ানায়। মস্কো থেকে কয়েকশ' কিলোমিটার দূরে। গাড়িতে আমরা চারজন। আমি, শঙ্করবাবু, আনাতোলে ও একজন রুশ যুবক। আমাদের গাড়ি চলেছে, ক্রেমলিন পার হয়ে, মস্কোভা নদী অতিক্রম করে, মস্কো শহর ছাড়িয়ে। গাড়িতে বসে শহর দেখছিলাম আর ভাবছিলাম প্রকৃতির বিরুদ্ধে কি কঠিন লড়াই করে মস্কো শহরকে পরিচ্ছন্ন রেখেছে মস্কোবাসী। নভেম্বর মাস শীতকাল। বিরতিহীন বরফ-বৃষ্টি চলছে। আধ ঘণ্টায় রাস্তা ঢেকে যাচ্ছে বরফে ; কিন্তু কোথাও একটু জল নেই, কোথাও জমে থাকা বরফ যান-বাহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে না। এই সুবিশাল শহরের প্রতিটি রাস্তা প্রতি আধ ঘণ্টায় পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। এতো হিম আবহাওয়া, এতো স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ কিন্তু তার মধ্যেও শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখা হয়েছে, যা অবিশ্বাস্য বলা চলে। একটি মোটর যন্ত্রের সাহায্যে রাস্তা থেকে বরফ তুলে নিচ্ছে সুনিপুণভাবে। রাস্তায় অবশ্য বরফ ছাড়া আর কিছু নেই। ময়লা বলতে রাস্তায় দু'একটি গাছের পাতা ছাড়া অন্য কিছু পড়া সম্ভব নয়। ফলের খোসা, কাগজের টুকরা বা সিগারেটের পরিত্যক্ত অংশ রাস্তায় ফেলা রুশবাসীর কল্পনার অতীত। গাড়ি চলছে আর দেখছি, মাঝে মধ্যেই পুরানো মস্কো ভেঙে নতুন করার কাজ চলছে। বড় বড় এলাকা কাঠের খুঁটি দিয়ে ঘেরা, মাঝখানে পুরোনো বাড়ি ভাঙা হচ্ছে। সেখানে উঠছে নতুন বাড়ি। পুরাতন নতুনকে জায়গা করে দিচ্ছে সর্বত্র। শহর থেকে একটু বাইরে এলে আরও বেশী

নতুনের সমারোহ। পরে খবর নিয়ে জেনেছিলাম, গৃহনির্মাণের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের অগ্রগতি অভূতপূর্ব। এবং এই গৃহনির্মাণের হার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। গৃহ সহ জনগণের স্বাচ্ছন্দ্য বর্ধনের কর্মসূচীকে সরকার গ্রহণ করেছেন জরুরী কর্মসূচী হিসাবে। ১৯২৬ থেকে ১৯৬৬—এই চল্লিশ বছরে সোভিয়েত ইউনিয়নে মোট ৮৪৪টি শহর নির্মিত হয়েছে। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৫ সাল—এই সাত বছরে আট কোটি লোককে নতুন ফ্ল্যাট দেওয়া হয়েছে। ১৯৬৮ সালে রাষ্ট্রীয় সমবায় সংস্থাগুলিতে কুড়িলক্ষ আধুনিক ফ্ল্যাট নির্মিত হয়েছে। সেদিন আর দূরে নয়, যেদিন সোভিয়েত ইউনিয়নে বাসগৃহ বলে কোন সমস্যা থাকবে না। ১৯৮০ সালের মধ্যে নব-বিবাহিতরা সহ প্রতিটি পরিবার স্বাস্থ্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ প্রয়োজনানুযায়ী এক একটি আরামদায়ক ফ্ল্যাট পাবেন। সোভিয়েত ইউনিয়নে এক একটি আধুনিক ফ্ল্যাট নির্মাণে রাষ্ট্রের গড় খরচ পড়ে চার হাজার রুবল। শুধু বাড়ি নয়, আগামী দশ বছরের মধ্যে জল, গ্যাস, ঘর-বাড়ি উত্তপ্ত করার বিদ্যুৎ প্রভৃতিরও কোন খরচ লাগবে না। বর্তমানে টেলিফোন, বিদ্যুৎ, টেলিভিশন সব মিলিয়ে আড়াই রুবলের বেশী খরচ পড়ে না।

আমাদের গাড়ি চলছে, শহর, গ্রাম—নগরের মধ্যে দিয়ে। মস্কোর সীমানা পেরিয়ে অনেক দূর এগিয়ে এসেছি। পথে একটা দৃশ্য আমার খুব ভালো লাগলো। সে হলো, ইস্কুল-গামী ছেলে-মেয়েরা রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে, যে-কোন যানবাহন যাচ্ছে, ছেলে-মেয়েরা হাত উঁচু করতেই বেশীর ভাগ যানবাহন দাঁড়িয়ে পড়ছে এবং ছেলে-মেয়েদের লিফ্‌ট দিচ্ছে। যে-সব যানবাহন লিফ্‌ট দিতে পারছেনা, তারাও গাড়ির গতি ধীর করে তাদের অক্ষমতা জানিয়ে যাচ্ছে। মস্কো শহরেও দেখেছি, মস্কোর বাইরে অনেক দূরে, মস্কোর তুলনায় পল্লী ও গ্রামের এলাকাতেও দেখছি

সর্বত্রই মেয়েদের ক্ষেত্রে "মিনি-ইন্-ড্রেস", ছেলেদের ক্ষেত্রে "ম্যাক্সি-ইন্-হেয়ার"। কথাপ্রসঙ্গে একসময় আনাতোলে আমাকে বলেছিলো, গত কয়েক বছরে এই মিনি-ড্রেস খুব চালু হয়েছে। আগে রাশিয়াতে ছোট পোশাক পরলেও মেয়েদের হাঁটু দেখা যেতো না ; কিন্তু এখন পোশাক হাঁটুর বেশ ওপরেই উঠে গেছে। আর ছেলেদের ক্ষেত্রে চুল-জুলফি মিলিয়ে সবই ম্যাক্সি। তবে, এটা এখনও সর্বজনীন নয়, ব্যতিক্রম পর্যায়ে আছে বলেই চোখে পড়ে।

আমাদের গাড়ি একটা রেস্তোঁরার সামনে থামানো হ'ল। চা-পানের বিরতি। বিরাট হল-ঘর। ঘরের সব টেবিলেই খানা-পিনার আসর। আমরা ঘরে ঢুকতেই সকলের নজর পড়লো, আমাদের দিকে। দু' একজন আনাতোলেকে রুশ ভাষায় কি জিজ্ঞাসা করলো, তারপরই দেখলাম হুটোপাটি। মুহূর্তের মধ্যে হুটোপাটি—আমরা কারা, আমাদের পরিচয় কি—এক টেবিল থেকে আর এক টেবিলে ছড়িয়ে পড়লো। সকলেই এগিয়ে এলো আমাদের দিকে। কেউ জড়িয়ে ধরছে, কেউ করমর্দন করছে, কেউ চুম্বন করছে আমাদের সারা মুখে। মাঝে মাঝে একটি শব্দ মাত্র বুঝতে পারছি ; সে হলো, "রাজ, রাজ।" পরে এই "রাজ" শব্দের অর্থ বুঝেছিলাম। আমরা ভারতীয়, তাই আমরা রাজকাপুর। এখানে যারা আছেন, তাঁরা সকলেই স্থানীয় কোন কারখানার শ্রমিক। সকলেই সামান্য কাজের বিরতিতে আহার-জলযোগের জন্যে এখানে এসেছে। বেশ কিছু সময় শ্রমিকদের সাথে আলোচনা করলাম। ভারতবর্ষ সম্পর্কে এই শ্রমিকদের মধ্যে দু' একজনই মাত্র ওয়াকিফহাল। পণ্ডিত নেহরু, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এই দুজনের নাম-ই বিশেষ পরিচিত আর পরিচিত রাজকাপুর ও রীতা। কে এই রীতা, প্রথমে বুঝতে পারিনি। বুঝেছিলাম অনেক পরে।

একসময় একটি মেয়ে, যে সামান্য ইংরেজী জানতো, সে আমায় প্রশ্ন করেছিলো, "তোমার রীতা কোথায়?" কোনক্রমে কে আমার রীতা হদিশ করতে না পেরে, তাকেই উল্‌টে প্রশ্ন করেছিলাম, রীতাটি কে? অনেকের মুখেই এই "রীতা রীতা" শুনে আসছি। সে তখন আমায় জ্ঞান দিয়েছিলো, "তুমি যদি রাজ হও, তবে রীতা হ'ল তোমার স্ত্রী।" আমি সিনেমা সম্পর্কে অজ্ঞ। তাই সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে একটু সময় লেগেছিল। মেয়েটি আমায় বুঝিয়ে দিল "রাজ" হ'ল রাজকাপুর আর "রীতা" হলো নার্গিস। "আওয়ারা" নামে একখানা ভারতীয় ছবিতে রাজকাপুর ও নার্গিস যথাক্রমে "রাজ" ও "রীতা"র ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নে ভারতীয় নামের জনপ্রিয়তায় যদি কারও শীর্ষস্থান থেকে থাকে, তবে সে স্থান হ'ল, "রাজ ও "রীতা"র অর্থাৎ রাজকাপুর ও নার্গিস-এর।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সপ্তাহে পাঁচদিন কাজ, বছরে মোট ১০৪ দিন ছুটি। সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রমিক ও মালিকের কোন প্রশ্ন নেই ; নেই ব্যক্তিগত নিয়োগকারী ও ভাড়াটে শ্রমিক। সোভিয়েত ইউনিয়নে বেকার নেই, বেকার থাকা সম্ভবও নয়। কাজের অধিকার হ'ল সকল সোভিয়েত জনগণের অলংঘ্য অধিকার। এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রমও হয়ে উঠেছে আনন্দ ও বৈষয়িক কল্যাণের উৎস। সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবাদপত্রে কোন বিজ্ঞাপন ছাপা হয় না। সংবাদপত্রে একটি মাত্র বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয়, সে হ'ল কর্মখালির। কর্মখালির বিজ্ঞপ্তি রেডিওতে প্রচার করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রকৃত পক্ষে এখন যে সমস্যা, সেটা হলো কাজের লোকের সমস্যা। যে পরিমাণ কাজ আছে, সে পরিমাণ কাজের মানুষ নেই। তাই ধানকাটা-গমকাটার মরশুমে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের ডাক পড়ে—কৃষকদের কাজে সাহায্য করতে।

কলেজের ছেলেরা চলে যায় রাজ্য থেকে রাজ্যান্তরে—কৃষকদের কাজের সাহায্যে। কাজে যোগদানের আগে থেকেই কর্মচারীরা বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা পান। যেটাকে বলা যায় প্রায় "জামাই-আদর"। একজন কর্মচারী কাজে যোগদান করতে গেলে তিনি ভাতা পান ; তার পরিমাণ হ'ল, (বেতন ছাড়াও) যে কদিন যেতে লাগে, তার বেতন, কর্মস্থলে যাবার সমুদয় খরচ, কর্মস্থলে গিয়ে গুছিয়ে বসবার ছ'দিনের খরচ, সেই সঙ্গে তার পরিবার ও সমস্ত মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে যাবার খরচ তো আছেই। সারা সোভিয়েত ইউনিয়নে সুদক্ষ শ্রমিক তৈরির জন্যে সবচেয়ে বেশী উদ্‌যোগ ও কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

ইচ্ছা থাকলে আট বছরের শিক্ষাসম্পন্ন যে কোনও তরুণ-তরুণী উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করে সুদক্ষ শ্রমিকে পরিণত হতে পারেন। শিল্প সংক্রান্ত কৃৎকৌশলগত শিক্ষা দেবার জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়নে হাজার হাজার স্কুল আছে। সেগুলিতে শিক্ষার সময় দুই থেকে তিন বছর। এখানে পড়তে কোনও খরচ লাগে না, এছাড়াও বহু ছাত্র রাষ্ট্র থেকে হয় পুরো খরচ পান অথবা বৃত্তি পান। প্রতিবছর এই সব বৃত্তি-শিক্ষার স্কুল শিল্প, যানবাহন, সংবাদ আদান-প্রদান, কৃষি, বাণিজ্য ও জনগণকে তৈরি খাদ্য সরবরাহের জন্য ১০ লক্ষেরও বেশী উপযুক্ত গুণসম্পন্ন শ্রমিককে তৈরি করে দেয়।

জনগণের উৎসর্গীকৃত কর্ম-প্রচেষ্টা হ'ল সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের জাতীয় বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক মানের ভিত্তি। ১৯৬৫ সালের তুলনায় ১৯৭০ সালে জাতীয় আয় ৪১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং শিল্প উৎপাদনের বৃদ্ধির হার ৫০ শতাংশ। এই সময়ের মধ্যে সামাজিক শ্রম-উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩৭ শতাংশ। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে জাতীয় আয় দাঁড়িয়েছিল ৩৫,২০০ কোটি রুবল, পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের সময়ের তুলনায় ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি।

১৯৬৬ থেকে ১৯৭০এর মধ্যে শ্রমজীবী জনগণের মাথাপিছু প্রকৃত আয় ৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে; ১৯৭০ সালে শিল্প ও দপ্তর শ্রমিকদের গড় মজুরী দাঁড়ায় ১২২ রুবল; সামাজিক ভোগ্য তহবিল থেকে প্রাপ্ত ভাতা ও প্রাপ্ত উপকার মিলে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬৪ রুবল। ১৯৬৫ সালে প্রাপ্ত ১২৯ রুবলের সঙ্গে তুলনা করলে তার পরিমাণ বেড়েছে ২৭ শতাংশ।

জনশিক্ষার ক্ষেত্রেও অনেক কিছু করা হয়েছে। ১৯৩৯ সালের আদমসুমারী অনুসারে শহরে শ্রমজীবী জনগণের ২৪.২ শতাংশ এবং গ্রামাঞ্চলে ৬.৩ শতাংশ মাধ্যমিক (সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ) অথবা উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত। ১৯৭০ সালের আদমসুমারীতে দেখা গেছে যে, এই সংখ্যা যথাক্রমে ৭৫ শতাংশ ও ৫০ শতাংশ হয়েছে। সপ্তাহতে ৫ দিন কাজ হওয়ার ফলে শিল্প ও দপ্তরের শ্রমিকগণ তাদের পড়াশুনা চালাবার নতুন করে সুযোগ পেয়েছে। ১৯৭০-৭১ এর পাঠ বৎসরে ৩৯ লক্ষ তরুণ শ্রমিক ও কৃষকদের বিদ্যালয়ে যোগদান এবং শহর ও গ্রামের ৪২ লক্ষ শ্রমজীবী মানুষ উচ্চ ও বিশেষ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বৈকালিক ও ডাক যোগে শিক্ষা গ্রহণ করেন। সোভিয়েত জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্যে নতুন নতুন প্রধান ব্যবস্থার একটি সমগ্র পদ্ধতি রচিত হয়েছে। ১৯৭৫ সালের মধ্যে প্রকৃত আয় ৩১ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। শিল্প ও দপ্তর শ্রমিকদের মাসিক গড় মজুরী প্রায় ১৫০ রুবল পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে এবং ন্যূনতম মজুরী দাঁড়াবে ৭০ রুবল। মধ্য আয়ের অন্তর্ভুক্ত শ্রমিকদের জন্যে মজুরীর হার ও বেতন বৃদ্ধি পাবে। ১৯৭১ সালে রেলপরিবহণ শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি পায় এবং কৃষিতে যন্ত্রচালকদের মজুরীর হারও বৃদ্ধি পায়। ১৯৭২ সালে শিক্ষক ও ডাক্তারদের মজুরী মোটামুটি ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পায় এবং প্রাক্-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানগুলির শিক্ষকগণ আরও বেশী বেতন পান। ইওরোপীয়

উত্তর এবং দূরপ্রাচ্য, সাইবেরিয়া এবং উরালের সমপর্যায়ে সুদূর উত্তরের শিল্প ও বৈষয়িক উৎপাদনের অন্যান্য শাখার মজুরীও বেতনভোগীদের জন্যেও মজুরী বৃদ্ধি করা হয়। ১৯৭২ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে উচ্চ, বিশেষ মাধ্যমিক ও কারিগরি বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রদের জন্যে ভাতা বৃদ্ধি করা হয়।

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অনাহার নেই, দারিদ্র্য নেই, বেকারি নেই। সমগ্রভাবে দেখলে, শ্রমশিল্প ও নির্মাণকার্যের শ্রমিকদের প্রকৃত আয় ১৯১৩ সালের তুলনায় ১৯৬৮ সালে বৃদ্ধি পেয়েছে ৭ গুণ। আর, কৃষকদের প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১০ গুণ। সোভিয়েতের মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণের জন্যে সোভিয়েত রাষ্ট্র কি করেছে তার একটা বড় নিদর্শন, সোভিয়েত আমলে মানুষের গড় আয়ুষ্কাল ৩২ বছর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৭০ বছর। রাশিয়ার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত ঘুরেছি, ঘুরেছি ক্ষেতে-খামারে, কলে-কারখানায়। মনে পড়েছে বারে বারে রবীন্দ্রনাথের কথা। প্রায় ৩৫ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন এদেশে। ঋষি রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া দেখে যে কথা সেদিন বলেছিলেন, মনে পড়ছিল বারে বারে সেই সব কথা। "রাশিয়ার চিঠি"তে রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় বলেছেন, "দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছি। আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদলে দিয়েছে। যারা মূক ছিল তারা ভাষা পেয়েছে, যারা মূঢ় ছিল তাদের চিত্তের আবরণ উদ্‌ঘাটিত, যারা অক্ষম ছিল তাদের আত্মশক্তি জাগরূক, যারা অবমাননার তলায় তলিয়ে ছিল আজ তাঁরা সমাজের অন্ধ কুঠুরি থেকে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে সমান আসন পাবার অধিকারী। এত প্রভূত লোকের যে এত দ্রুত এমন ভাবান্তর ঘটতে পারে কল্পনা করা কঠিন। এদের এতকালের মরা গাঙে শিক্ষার প্লাবন বয়েছে দেখে মন পুলকিত হয়। দেশের এক

প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত সচেষ্ট, সচেতন। এদের সামনে একটা নূতন আশার বীথিকা দিগন্ত পেরিয়ে অবারিত—সর্বত্র জীবনের বেগ পূর্ণমাত্রায়।" রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় এসেছিলেন যখন সবেমাত্র রাশিয়া বিপ্লবোত্তর কাল পেরিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় পদক্ষেপ রেখেছে। তারপর অনেক বছর কেটে গেছে, রাশিয়া আরও অনেক এগিয়ে গেছে। আমরা সেই এগিয়ে যাওয়া রাশিয়াকেই দেখছি। রবীন্দ্রনাথ যদি বেঁচে থাকতেন এবং এই সত্তরের দশকের রাশিয়াকে দেখতেন, তবে জানিনা, কবি আরও কতো আনন্দই না প্রকাশ করতেন।

মস্কো থেকে ছ'সাত ঘণ্টা একনাগাড়ে গাড়ি চালিয়ে আমরা মহাতীর্থ স্থান ইয়াসনাইয়া পলিয়ানা পৌঁছোলুম। পাঁচিলে ঘেরা বিরাট এস্টেট। গেটের সামনে গাড়ি দাঁড়ালো। ভিতরে গাড়িতে প্রবেশ নিষেধ। আমাদের দো-ভাষী আনাতোলে গেটের কাছে গিয়ে পাহারারত পুলিশকে কি বললো জানিনা; কিন্তু গেটটা খুলে গেল। আমরা গাড়ি নিয়ে এস্টেটের মধ্যে প্রবেশ করলাম। গাড়িতে যেতেই আমাদের বেশ কয়েক মিনিট লাগলো। এই পথ হেঁটে যেতে আরও অনেক বেশী সময় লাগতো সন্দেহ নেই। তার চেয়ে বড় কথা এই পথে হাঁটা আমাদের পক্ষে সম্ভবও ছিল না। বিশেষ করে আমরা যে ধরনের জুতো পরি, এ তো অচল। কলকাতা থেকে আসবার সময় আমার বিশিষ্ট বন্ধু লোকসভার সদস্য সরকার আমজাদ আলী আমার জুতো কেনবার সময় সঙ্গে ছিলেন। আমজাদ আমার জন্মে যখন বাটা কোম্পানীর সবচেয়ে দামী ঢাউস একজোড়া জুতো পছন্দ করে দিল, তখন মনে হয়েছিল এটা বাহুল্য। এখন মনে হচ্ছে

এ জুতো শীতকালে রাশিয়ায় বেড-রুম শ্লিপার হিসাবেও কেউ ব্যবহার করবে না। সমগ্র অঞ্চলটি বরফে ঢাকা। জমাট বাঁধা বরফের উপর পা ফেলে অগ্রসর হওয়া সার্কাসে ভারসাম্যের খেলার চেয়ে কঠিন। একবার আমি নিজে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম। কিন্তু শঙ্করবাবু কোনক্রমেই নিজেকে বাঁচাতে পারলেন না। শঙ্করবাবু যেভাবে সশব্দে বরফের উপর পড়ে গেলেন, আমি ভাবলাম হয়েছে। হাত-পা-মাথা একটা কিছু ভাঙবেই আর হাসপাতালে যেতে হবেই। কিন্তু না, বরফে পড়লে বোধ হয় কিছু হয় না। তু'তিনজনে ধরে শঙ্করবাবুকে দাঁড় করানো হ'ল। শরীর থেকে বরফ ঝেড়ে ফেলা হ'ল। "লেগেছে না কি ?" এই কথাটা জিজ্ঞাসা করতেও ভয় করছিলো। কিন্তু না শঙ্করবাবু নিজেই সহাস্যে বললেন, "না, কিছু লাগেনি।" আমরা ঋষি তলস্তয়ের বাড়ির সীমানায় প্রবেশ করতেই একটা গাছের গোড়ায় একখানা পাথর দেখানো হ'ল। এই পাথরখানি হ'ল ঋষি তলস্তয়ের জন্মস্থানের স্মারক। আরও কয়েক পা এগিয়ে গিয়েই পৌঁছোলুম তলস্তয় মিউজিয়ামে। মিউজিয়ামের দোর গোড়ায় পৌঁছুতেই এক সু-বেশী সুন্দরী তরুণী আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। এই তরুণী মিউজিয়ামের গাইড্। গাইড্ আমাদের ভিতরে নিয়ে গেলেন। প্রথম ঘরে গিয়ে আমাদের খুলতে হ'ল ওভারকোট, টুপী। পরের ঘরে গিয়ে খুলতে হ'ল জুতো। চামড়ার জুতো খুলে পশমের জুতো পরতে হলো। তারপর এগিয়ে চললাম তীর্থদর্শনে। ঋষি তলস্তয়ের এই বাড়ি, এই সাধন-স্থল, যা আজ একটি সংগ্রহশালা, বিশ্বের মানুষের কাছে তীর্থস্থল। কতো মনীষী এসেছেন এই তীর্থে, এসেছেন আমাদের মতো কতো তীর্থযাত্রী।

ইয়াসনাইয়া পলিয়ানা একটি অসাধারণ সংগ্রহশালা। সোভিয়েত রাষ্ট্র এটিকে অতি সযত্নে লালিত এবং সংরক্ষিত করে

চলেছে। এস্টেটর মালিক লেভ্ নিকোলেভচ তলস্তয়ের' জীবিত অবস্থায় এখানকার সমস্ত আসবাবপত্র, তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবহারের সামগ্রী, যেটি যে-অবস্থায় ছিল, আজও প্রতিটি জিনিস ঠিক সেই অবস্থায় আছে—রাখা হয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে যে বিখ্যাত বইগুলি স্থান পেয়েছে, যার লেখক ছিলেন তলস্তয়, তার প্রায় সমস্তগুলিরই জন্ম এই ইয়াসনাইয়া পলিয়ানায়।

প্রথমেই যে ঘরটির ভেতর দিয়ে ঢুকতে হয়, যাকে বলা হয় "এনট্রান্স হল", তার চতুর্দিকেই বার্চ কাঠের বুক-কেস। এই বইয়ের তাকগুলিতে অসংখ্য ভাষার অসংখ্য বই নানা বিষয়ের উপর লিখিত। দরজার পাশেই দেওয়ালের কাছে ডাক-বিলি সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি রাখবার স্থান। নিকটবর্তী রেলওয়ে স্টেশন থেকে প্রতিদিনই সেখানে নানা রকম পত্রপত্রিকা থেকে শুরু করে চিঠিপত্র এসে জমা হতো। শুনলাম, তাঁর মৃত্যুর শেষ বৎসরে অর্থাৎ ১৯১০-এ তাঁর কাছে দিনে প্রায় কুড়ি থেকে পঁচিশটা চিঠি আসত।

শিকার করাও যে তাঁর একটি প্রিয় নেশা ছিল, তা বুঝলাম ঐ ঘরেই তাঁর হান্টিং গান এবং অন্যান্য সাজসরঞ্জাম দেখে।

সমুখের দরজার ডান দিকেই পরিচারকের ঘর। তার পাশেই সিঁড়ি উঠে গেছে দ্বিতলে, যেখানে তাঁর থাকবার ঘর, লাইব্রেরি ইত্যাদি। ঘরের দেওয়ালগুলিতে সারি সারি সাজানো অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতকের বিখ্যাত এবং নাম-না-জানা শিল্পীদের অঙ্কিত নানা রকম অয়েলপেন্টিং। দরজার ঠিক উপরেই সুন্দর কাজ-করা ফ্রেমে বাঁধানো ১৭৩৩-১৮০৭-এর লেখক এম. খেরাস্‌কভের একখানি পোর্ট্রেট। তার পাশেই আরও দু'খানি একই ধরনের পোট্রেট— একটি জেনারেল এস. এফ. গোলিৎসিন, যিনি ছিলেন তলস্তয়ের পিতামহীর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু, আর একটি এ. এ. ভল্‌কোন্‌স্কি, তাঁর মাতার একজন নিকট আত্মীয়।

এই ঘরটি থেকে বেরিয়েই পা দিলাম পারলারে যাকে বলা হতো ইয়াসনাইয়া পলিয়ানার সর্ববৃহৎ ঘর। এই পারলারটি ছিল তলস্তয়ের মাল্‌টিপারপাস ঘর। এখানে না হ'ত এমন কিছু নেই। পরিবারের লোক, অতিথি এবং দর্শনার্থী—প্রত্যেকেই, প্রতিদিন একবার এসে জড়ো হতেন এখানে। এটি ব্যবহৃত হতো কখনও ভোজনালয় হিসেবে, কখনও বা সোস্যাল পার্টি রুম হিসেবে, কখনও বা বয়স্ক ও তরুণদের গভীর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাকক্ষ হিসেবে। তৎকালীন নামী এবং অ-নামী বহু লোকই এসেছিলেন এই পারলারে এবং আলোচনা করেছেন নানা বিষয়ে—রাশিয়ার সাংস্কৃতিক সমস্যা, অর্থনৈতিক উন্নতি, সামাজিক সমস্যা, শিল্প-কলা প্রভৃতি। এখানে যাঁরা আসতেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যেমন বিখ্যাত লেখক তুর্গেনিভ, ফেট, লেসকভ, চেকভ, কোরোলেচকো, ম্যাক্‌সিম গোর্কি এবং স্তেসভ; বিখ্যাত শিল্পী ক্রামস্কয়, রেপিন, গে এবং নেস্তারভ; বিপ্লবী পপিউলিস্ত এবং ভূতপূর্ব রাজনৈতিক বন্দী মরোজভ; বৈজ্ঞানিক মেক্‌নিকভ। এছাড়াও আরও অনেক, অসংখ্য মানুষ, ছাত্র, জ্ঞানার্থী প্রভৃতিরা আসতেন বহু দূর-দূরান্ত থেকে।

এই পারলারে, এই খাবার টেবিলটিকে ঘিরে নামী এবং অনামী মানুষদের যে-জমায়েত হ'ত এবং যে-সমস্ত আলোচনা ও ব্যাখ্যা ইত্যাদির আসর জমে উঠত সে সমস্তরই প্রাণকেন্দ্র ছিলেন তলস্তয়। তাঁর প্রতিটি কথা, তাঁর প্রতিটি ভাবভঙ্গী প্রত্যেকে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করত। এ সম্বন্ধে ম্যাক্‌সিম গোর্কি একবার বলেছিলেন— "One had to witness it to understand the very special, inexpressible beauty of his speech which seemed incorrect, full of repetitions of the same words and as simple as the speech of a peasant.

The power of his words was not only in his intonation and facial movements, but in the play and gleam of his eyes, the most expressive I have ever seen. Tolstoi had a thousand eyes in just one pair."

পারলারটির মাঝখানেই ছিল সুবৃহৎ খাবার টেবিলটি, যেটি এখনও একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। প্রদর্শক-মহিলাটির বর্ণনা শুনতে শুনতে চোখ বন্ধ করেও যেন দেখতে পাচ্ছি টেবিলটার একদম মাথার দিকে বসে আছেন বড় মেয়ে সোফিয়া আর তার ডান পাশেই একটি বাঁকানো হলুদ-রঙের আরাম-কেদারায় স্নেহপূর্ণ পিতা স্বয়ং তলস্তয়। তাঁরা প্রতিদিনই ব্রেকফাস্ট করতেন সকাল ন'টায়, দ্বি-প্রহরের আহার বেলা একটায়, বৈকালিক চা ছ'টায় এবং নৈশভোজ রাত ন'টায়।

পারলারটির বাঁদিকের কোনায় ছিল আর একটি বড় মেহগনি-কাঠের টেবিল, একটি সোফা এবং একটি আরাম-কেদারা। টেবিলটার উপর ছিল কাগজের শেড দেওয়া একটি ল্যাম্প। পরিবারের লোকদের এবং অতিথিদের বৈকালিক আসরটি জমত এখানেই। কখনও হয়ত মেয়েরা কেউ বসে সেলাইয়ের কাজ করছেন আর স্বয়ং তলস্তয় অথবা অন্য কেউ উচ্চৈঃস্বরে তাঁর লেখা পাঠ করে চলেছেন—এই সুন্দর দৃশ্যটি একটি বড় পোর্ট্রেটে ধরে রেখেছেন শিল্পী এল. পাস্তেরনাক তাঁর "Tolstoi in his Family Circle" চিত্রটিতে।

এই আসরটির ঠিক উলটোদিকের কোনায়ই জমত আরেকটি আসর। সেখানেও সাজানো ছিল একটি গোল টেবিল, একটি হলদে বাঁকানো আরাম-কেদারা, দুটি কোচ। এই আসরটি বসত তরুণদের নিয়ে, নাম ছিল "Young People's Corner."

এনট্রান্স হল্‌টির উলটো দিকেই পারলারের দেওয়ালে টাঙানো ছিল পরিবারবর্গসহ তলস্তয়ের একটি বড় পোর্ট্রেট, যেটির শিল্পী ছিলেন ১৮-১৯ শতকের একজন রাশিয়ান চিত্রশিল্পী। এই ছবিগুলির সারিতে যে ছবিটা প্রথমেই স্থান পেয়েছিল সেটি আইভান ক্রামস্কয়ের আঁকা তলস্তয়ের পোর্ট্রেট, যে সময় তলস্তয় আনা কারেনিনা লিখেছিলেন। আরও একটি চিত্র দেখলাম সেটি তলস্তয়ের কন্যা সোফিয়ার—এঁকেছেন শিল্পী নিকোলাই গে। এছাড়া আরও বহু চিত্রকরের আঁকা অসংখ্য ছবি সারা ঘরগুলোতেই সাজানো।

পারলার থেকে বেরিয়েই তাঁর থাকবার ঘর। দক্ষিণমুখো দু'টো জানলা এই ছোট্ট ঘরটিকে আলো-বাতাসে ভরপুর করে রাখে। এই ঘরটি তলস্তয় উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন তাঁর অত্যন্ত আদরের আন্টি তাতিয়ানা আলেকজান্দ্রোভ্‌না.ইয়ারগোলস্কায়া-র কাছ থেকে। তাঁর ছেলেবেলাও বলতে গেলে এখানেই অতিবাহিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ১৮৭৪ থেকে এটি তাঁদের (বিশেষ করে তাঁর স্ত্রীর) নিজস্ব ঘরে পরিণত হয়েছে। এই ঘরের একটি কোনায় দরজার ঠিক ডান দিকেই ছিল তাঁর স্ত্রীর লেখবার জায়গা। তাঁর স্ত্রীর লেখবার জায়গা বললাম এই জন্যই যে, তলস্তয়ের সমস্ত লেখাই অনুলেখন করতে হতো তাঁর স্ত্রীকে। অবশ্য বর্তমানে তাঁর সেই লেখবার টেবিলটা আর এখানে নেই—সেটি স্থানান্তরিত হয়েছে মস্কোর তলস্তয় মিউজিয়ামে। এখন এখানে এই ইয়াসনাইয়া পলিয়ানার এই ঘরে স্থান পেয়েছে পুরোপুরি রাশিয়ান কায়দার একটি ডেস্ক। এখনও চোখ বন্ধ করলেই দেখা যায় মিসেস সোফিয়া আন্দ্রেইভ্‌না (তলস্তয়ের স্ত্রী) তাঁর এই ছোট্ট লেখার টেবিলটার ওপর ঝুঁকে পড়ে তলস্তয়ের দুর্বোধ্য লেখার কপি করে চলেছেন। অবশ্য এই ধরনের কল্পনা আপনি করতে পারবেন না যদি না তাঁদের

কন্যা ইলিয়া তলস্তয়ের এই চিঠিটা পড়ে থাকেন: "She sat in the living room near the parlour, at her little writing desk, and spent all her free time writing. Bent over the paper, peering at father's scribbles with her near-sighted eyes, she sat thus whole evenings on end and often went to bed late at night, after everyone else."

দরজার বাঁদিকেই ছিল একটি গোল মেহগনি কাঠের টেবিল, একটি কৌচ, দুটি নিচু আরাম-কেদারা। দেওয়ালের কাছে কৌচের পাশেই একটি ছোট্ট বাঁশের টেবিল—যেটি মিসেস সোফিয়াকে তাঁর জন্মদিনে উপহার দিয়েছিল তাঁর কন্যা মারিয়া। জানলাটির পাশে ছিল একটি কাবার্ড যার উপরে দু'টি প্লাস্টার মূর্তি। এ ঘরটির দেওয়ালেও আছে বেশ কিছু সংখ্যক পোর্ট্রেট যার সবই তলস্তয় এবং তাঁর আত্মীয়স্বজনের। একটি মাত্র ল্যাণ্ডস্কেপ দেখলাম—সেটি ইয়াসনাইয়া পলিয়ানার।

এই থাকবার ঘরটির লাগোয়াই যে বিশাল দরজা-জানলা যুক্ত ঘরটিতে পৌঁছলাম সেটি ছিল স্টাডি (লেখাপড়ার ঘর)। এইঘরটি দুবার তলস্তয়ের স্টাডি-রূপে ব্যবহৃত হয়েছিল। একবার ১৮৫৬ থেকে ১৮৬২ পর্যন্ত এবং তারপর ১৯০২-এর গ্রীষ্ম থেকে ১৯১০-এর ২৮শে অক্টোবর—তাঁর ইয়াসনাইয়া পলিয়ানা ত্যাগের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত। এই ঘরটিতে বলতে গেলে তলস্তয় তাঁর জীবনের প্রায় সবকটি রচনা সমাপ্ত করেছিলেন।

থাকবার ঘর থেকে ঢুকতেই বাঁদিকে ছিল, সবুজ চওড়া কাপড়ের ঢাকনিওয়ালা, তিন-ড্রয়ার-যুক্ত তাঁর বিরাট লেখবার ডেস্কখানি।

যতদিন তিনি এই ইয়াসনাইয়া পলিয়ানায় ছিলেন তার বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে তাঁর এই ডেস্কে বসে। এটিও তিনি লাভ করেছিলেন তাঁর পিতার কাছ থেকেই।

এই ডেস্কটির উপরে যেসমস্ত খুঁটিনাটি জিনিসপত্রগুলি আছে তাদের প্রত্যেকটিরই একটি অনুভূতিগত বিশেষ মূল্য আছে। টেবিলটির উপরে ছিল কাগজ রাখবার একটি চামড়ার বাক্স, একটা ব্রোঞ্জের কুকুরের মূর্তির পেপারওয়েট এবং আরও একটি সবুজ বড় অমসৃণ কাঁচের পেপারওয়েট। এই কাঁচের পেপারওয়েটটি তলস্তয়ের খুব প্রিয় জিনিসের একটি ছিল। এটি তিনি উপহারস্বরূপ পেয়েছিলেন দিয়াদকোভস্কি মলৎসেভস্কি ক্রিস্টাল ওয়ার্কার্স-এর কর্মীদের কাছ থেকে। আর ব্রোঞ্জের কুকুরের অবয়বের পেপারওয়েটটি পেয়েছিলেন তাঁর আন্টির কাছে থেকে। এই পেপারওয়েটটির উল্লেখ পর্যন্ত আছে তাঁর উপন্যাস রেসারাকসন-এ। এছাড়া টেবিলের উপরে যে সমস্ত বই আছে তার মধ্যে একটি হ'ল আই ইলাসত্রভের "The life of the Russian People in Proverbs and Sayings". বইটি তলস্তয় ক্রয় করেছিলেন ১৯১০-এ।

ড্রয়ারগুলিও খুলে দেখানো হ'ল। তাতে ছিল তাঁর পেন, পেনসিল. একটি পেনসিল-কাটা ছুরি, কাগজ-কাটা মেসিন আরও নানা টুকিটাকি। এছাড়া দেখলাম অনেকগুলি চিঠিপত্র যেগুলিতে ডাকঘরের ডেট্ স্ট্যাম্প ছিল ১৯১০-এর। এগুলির সিল ভাঙা হয়নি, কারণ এগুলো এসেছিল তাঁর ইয়াসনাইয়া পলিয়ানা ত্যাগের পরে অথবা তাঁর মৃত্যুর পরে। টেবিলটির পাশেই একটি ছোট আর্মচেয়ার—এটি ছিল তাঁর কন্যা তাতিয়ানার। ডেস্কের পাশে দেওয়ালের ধারে ছিল একটি কাপড়ে-ঢাকা কৌচ, যেখানে লেখার পরে তিনি ক্ষণেক বিশ্রাম করতেন। এই কৌচটির ড্রয়ারে

থাকত তাঁর লেখার পাণ্ডুলিপিগুলি। এগুলি তিনি কাউকে ছুঁতেও দিতেন না। বিপরীত দিকের দেওয়ালের কাছে আর একটি আর্মচেয়ার, তার পাশে আর একটি। দ্বিতীয়টি ছিল বেশ গভীর—এটিতে বসে তিনি প্রাতঃকালীন কফি পান করতেন। ডেস্কটির উপরের দিকে একটি বুক-সেল্‌ফ। সেল্‌ফের সর্বোপরি ছিল ব্রোখাস এবং এক রকমের এন্‌সাইক্লোপেডিয়া ডিকশনারী আর সর্বনিম্নে দর্শন এবং ধর্মগ্রন্থসম্বন্ধীয় নানা বইপত্র।

এই ঘরটির দেওয়ালেও অন্যান্য ঘরের মতোই অসংখ্য পোট্রে ট—তাদের মধ্যে তুর্গেনিভ, ফেট, মিক্রাসভ এবং কোভালেভস্কি-ও আছেন। থাকবার ঘরের দিক থেকে ঢুকতেই ডানদিকে ওপরেই আর একটা পোট্রে ট ছিল যাঁকে তলস্তয় অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন—তিনি চার্লস ডিকেন্স।

ঘরটির সাজসজ্জা এবং নানা খুঁটিনাটি জিনিসগুলো তলস্তয়ের জীবিত অবস্থা থেকেই এমন ভাবে এখনও রাখা আছে, যেন মনে হ'ল তিনি এই মাত্র কোথাও বেরিয়েছেন, এক্ষুনি আবার এসে এ ঘরে ঢুকবেন।

স্টাডির লাগোয়াই ব্যালকনির দিকে খোলা দুটি বৃহৎ জানলা-যুক্ত একটি ঘর। ঘরটি তলস্তয় ১৮৬২ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত শয়ন ঘর হিসেবে ব্যবহার করে এসেছেন। তাঁর আগে ঘরটি ব্যবহার করতেন তাঁর পিতা। অবশ্য এই ঘরের সাজ-সজ্জা আগে যেমন ছিল তেমনই রেখেছিলেন তিনি। ঘরের একপাশে শোবার খাটটি ছিল লোহার। কিন্তু তিনি স্প্রিং ব্যবহার করতেন না ঘোড়ার লোমের কম্বলই ছিল তাঁর পছন্দ। আর খাটের সামনে নীচে ছিল একটি উলের রাগ্, যেটি বুনেছিলেন তাঁর স্ত্রী। খাটের পাশেই একটি গোল টেবিল, তাতে ছিল স্ট্যাণ্ডের উপর একটি গোল ঘড়ি, একটি ঘণ্টা, একটি মোমবাতিদানি, একটি দেশলাই বাক্স রাখবার আধার আর

নানারকমের ওষুধ রাখবার বোতল। টেবিলটির উপরে একটি কার্ডবোর্ডের বাক্সও ছিল, তাতে ছিল কিছু পেনসিল ও পেন। টেবিলটার ড্রয়ারে ছিল কিছু ব্যাণ্ডেজ, কার্বন পাউডার আরও নানা টুকিটাকি। দেওয়ালের পাশে একটি আলমারি, একটি সিন্দুক, আর তার পাশে জামা-কাপড় রাখবার জায়গা—তাতে তিনি ঝুলিয়ে রাখতেন জামা, তাঁর কোট ইত্যাদি। দেওয়ালে ঝোলানো যে আয়নাটি ছিল তার তলায়ও একটি টেবিল। টেবিলটার উপরে ধাতুনির্মিত একটি বাক্স আর তাতে নানা রকম ওষুধ এবং প্রেসক্রিপশন। টেবিলে আরও একটি ছোট লম্বা ধরনের বাক্স—যাতে ছিল কয়েকটা ইলেকট্রিক পেনসিল ও তার ব্যাটারি।

এ ঘরের দেওয়ালগুলিও যে নানা রকম পোর্ট্রেটে ঢাকা ছিল তা তো বলাই বাহুল্য। তবে বিশেষত্বের মধ্যে এ ঘরে তাঁর কন্যা তাতিয়ানার অঙ্কিত আরেক কন্যা মারিয়ার একটি তেল-রংয়ের পোর্ট্রেটও রয়েছে দেখলাম।

পরবর্তী ঘরে প্রবেশ করতেই মনে হ'ল কোন এক স্নেহময়ী জননীর ঘরে এসে ঢুকলাম। অথবা, কোন এক কর্তব্যসচেতন সুগৃহিণীর ঘরে। কারণ অন্যান্য সমস্ত ঘর থেকেই এ ঘরটির একটি বিশেষত্ব সর্বাগ্রে চোখে পড়ে। এ ঘরেও অসংখ্য পোর্ট্রেট রয়েছে এবং রয়েছে নানান আসবাবপত্র। তবুও নানা জিনিস দেখেই এটি অনুমিত হয় যে এটি একটি মহিলার ঘর। হ্যাঁ, এটি হলো শ্রীমতী সোফিয়া আন্দ্রেইভ্না তলস্তয়ের ঘর, যে-ঘরটিতে তিনি বাস করেছিলেন ১৮৯৪ থেকে ১৮৯৭ পর্যন্ত।

দেওয়ালগুলি আবৃত ছিল শ্রীমতী সোফিয়ার নাতি-নাতনিদের পোর্ট্রেটে, যার মধ্যে অনেকগুলি তিনি নিজেই তুলেছিলেন এবং এনলার্জ করিয়ে ছিলেন। বলতে গেলে তিনি একজন ক্যামেরা-

অনুরাগিনী ছিলেন, কারণ, কেবলমাত্র ডেভেলপ্‌ড ফোটোই নয়, অসংখ্য নেগেটিভ ফোটোও তাঁর সংগ্রহশালায় দেখা গেল। তাঁর একটি ফোটোর অ্যালবামে দেখলাম লেখা রয়েছে—Scenes from the Life of L. N. Tolstoi। তাঁর সুগৃহিণীপনার আর একটি নিদর্শন দেখলাম জানলার কাছে, লিখবার ডেস্কটার পাশেই—একটি সেলাই মেশিন। এটির সাহায্যে তিনি নিজেই বাচ্চাদের জামা-কাপড়, (এমন কি তলস্তয়েরও) সেলাই করে দিতেন। এই মেশিনটি সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলেছেন—"My Sewing machine is forty-five years old. It was my mother's machine. It is really historic···"

মেশিনটির পাশে যে ডেস্কটির উল্লেখ করা হয়েছে সেটি ছিল তাঁর লেখবার ডেস্ক। এর ওপরে ছিল দু'টো মোমাধার এবং একটি কেরোসিন ল্যাম্প।

এই ডেস্কের ওপরেই দেওয়ালে ঝোলানো তলস্তয়ের কনিষ্ঠতম এবং প্রিয়তম পুত্র আইভানের পোর্ট্রেট—যে শৈশবেই মারা গিয়েছিল একদা এক ভীষণ জ্বরে। এছাড়াও ঘরটিতে আরও নানান খুঁটিনাটি, প্রয়োজনীয় জিনিস, খাট, ড্রেসিং টেবিল ইত্যাদি তো ছিলই। সর্বোপরি, ঘরটিতে ঢুকলেই একজন কর্তব্যপরায়ণা, স্নেহময়ী, বিষাদ-ভারাক্রান্ত মহিলার ছবি স্মৃতিপটে জাগরূক হয়ে ওঠে। আর সব চাইতে বেদনাময় যেটা, সেটা হলো স্ত্রীর আগেই মারা গেলেন তলস্তয় স্বয়ং। তখন শ্রীমতী সোফিয়ার সেই নিঃসীম একাকীত্বের সামান্য একটু আভাস ফুটে উঠেছিল তারই একটি লেখায়—"···my lonely life at Yasnaya Polyana and the energy which was formerly spent on living go now to···carrying on···my existence···with humble resignation"

ইয়াসনাইয়া পলিয়ানার দক্ষিণ দিকের ত্রিতলে পাশাপাশি দু'টি

ঘর। একটি সেক্রেটারিয়াল, আর একটি লাইব্রেরি। এই সেক্রেটারিয়াল ঘরটি তলস্তয় ব্যবহার করতেন তাঁর অফিস হিসেবে। অবশ্য নানা সময়ে নানাভাবে এই ঘরটি ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। ১৮৬২ থেকে ৬৩-পর্যন্ত এটি ছিল শ্রীমতী সোফিয়া আন্দ্রেইভ্‌নার ঘর; ১৮৬৩-র জুন থেকে ১৮৬৪-র অক্টোবর পর্যন্ত এটি ছিল নার্সারি; ১৮৬৪ থেকে ১৮৬৬ পর্যন্ত এটি ছিল তাঁর স্টাডি (এই সময় এখানে "ওআর অ্যাণ্ড পীস্"-এর কিছুটা লেখা হয়েছিল); আর ১৮৭০ থেকে ১৮৯০ পর্যন্ত এটি আবার ব্যবহৃত হয়েছিল নার্সারী রুম, মহিলাদের ঘর এবং অতিথিশালারূপে। বিভিন্ন সময়ে এই ঘরে গভর্নেসরাও বাস করেছেন। ১৯০৭-এর প্রথমদিকে এখানে কাজ এবং বাস করেছেন তলস্তয়ের সেক্রেটারিগণ। তাঁদের মধ্যে প্রথমে এন. এন. গুসেভ্ এবং তারপর ভি. এফ. বুলগাকভ-ই প্রধান।

এখানে জানলার পাশেই ছোট্ট একটি টেবিলে অবস্থিত একটি রেমিংটন টাইপরাইটার। এই টাইপরাইটারটির সাহায্যেই টাইপ করা হতো তাঁর পাণ্ডুলিপিগুলি। তাছাড়া প্রেস থেকে আসা তাঁর প্রুফ ইত্যাদির সংশোধন, চিঠিপত্রের উত্তরদান সবই সম্পাদিত হতো এই ঘরে।

এই ঘরটির সাজসজ্জাও এমন ছিল যা দেখলেই বোঝা যায়, অফিসিয়াল কাজকর্মের জন্য একেবারে উপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। এখানে কৌচ ছিল আর তার সামনে একটি সাধারণ কাঠের টেবিল। কয়েকটি ড্রয়ারযুক্ত এই টেবিলটিতে বাচ্চারা বসে পড়াশুনা করত। কৌচের ওপরে দেওয়ালে একটি ল্যাণ্ডস্কেপ এবং তার পাশের দেওয়ালে একটি অয়েল পেনটিং, যেটিতে আঁকা ছিল তলস্তয়ের সেই প্রিয় ঘোড়াটি, যেটিতে চ'ড়ে তিনি সকাল সন্ধ্যা ভ্রমণে বেরুতেন। এছাড়া আরও কয়েকটি পেনটিং দেওয়ালে ঝোলানো দেখলাম।

আগেই বলেছি এই লাগোয়া দু'টি ঘরের একটি লাইব্রেরি। ঢুকতেই সর্বাগ্রে যা চোখে পড়ে তা এর বিশাল কাঁচের জানলা —যার জন্য ঘরটি সর্বদা উজ্জ্বল আলোয় ভরপুর থাকে। এ ঘরটিও লাইব্রেরির আগে নানাভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, খাবার ঘর হিসেবে, ক্লাস রুম হিসেবে, গভর্নেস রুম হিসেবে, নার্সারি হিসেবে ইত্যাদি ; অবশেষে ১৮৯০-এর শেষে তাঁদের প্রিয়তম পুত্র আইভানের মৃত্যুর পরে লাইব্রেরি হিসেবে।

ঘরটির সাজসজ্জার মধ্যে প্রধান ছিল ৯টি সুবৃহৎ বুককেস। সমগ্র ইয়াসনাইয়া পলিয়ানা হাউস জুড়ে মোট বুককেস ছিল ২৮টি এবং সর্বমোট বইয়ের ভলিউম ছিল ১০,২৪৭ খানি। এই লাইব্রেরিটা তৈরি করেছিলেন তলস্তয়ের মাতামহ এবং পিতা।

ইয়াসনাইয়া পলিয়ানার লাইব্রেরিতে যে শুধু বইয়ের সংখ্যাই এমন বিরাট অঙ্কের ছিল তাই নয়, নানা ভাষা এবং বিষয়েও এর বিশেষত্ব ছিল। যে যে ভাষার বই এখানে দেখলাম তার মধ্যে রুশ, ইংরেজী, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইতালিয়ান, সুইডিশ, জাপানিজ, গ্রীক, সারবিয়ান, স্প্যানিশ, ড্যানিশ—এমন কি হিব্রু পর্যন্ত। আর বইগুলির বিষয় বিবিধ। দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সমাজনীতি অর্থনীতি, রাজনীতি—কি নয়?

এনট্রান্স হল থেকে সিঁড়ি দিয়ে নিচের দিকে নামবার সময় করিডরে সারিবদ্ধ কিছু বুককেস। এর বাঁদিকে ছিল প্যান্টি, ডান দিকে "মায়াকোভস্কির" ঘর। ঘরটি আগে ব্যবহৃত হয়েছে পরিচারকদের ঘর হিসেবে, বাচ্চাদের শিক্ষকের ঘর হিসেবে, এক অংশ অতিথিদের ঘর হিসেবে এবং পরিশেষে তলস্তয়ের ব্যক্তিগত ডাক্তারের ঘর হিসেবে। এর সাজসজ্জা অত্যন্ত সাদাসিধে—দুটো সাধারণ চেস্ট, একটা টেবিল, কয়েকটা চেয়ার, একটা ভাঁজকরা খাট, একটি বুকসেল্‌ফ এবং একটা ওষুধ রাখবার দেওয়াল আলমারি।

মায়াকোভস্কির ঘরের দরজার সঙ্গে যুক্ত যে-ঘরটি সেটিকে বলা হয় Vaulted Room। এই ঘরটিও নানা সময় নানা ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এর সাজসজ্জার মধ্যে একটি আরাম কেদারা —যেটি স্ত্রী সোফিয়া আন্দ্রেইভনার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। এ ছাড়া আরও কিছু চেয়ার টেবিল, একটি আয়না এবং একটি পালঙ্ক। দেওয়ালে জানলার বিপরীত দিকে পরিবারবর্গসহ তলস্তয়ের একটি পোর্ট্রেট।

এনট্রান্স হলের বিপরীতদিকের দরজার সোজাসুজি যে-ঘরটি সেটি হ'ল অতিথিশালা। এই ঘরটিই তলস্তয়ের অতিথিবর্গ, যাঁরা রাত্রিযাপন করতেন, তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। শুধু অতিথিশালা হিসেবেই নয়, তলস্তয়ের পরিবারের লোকেরা এটিকে আরও দুটি নামে অভিহিত করত—"নিচের তলার লাইব্রেরি" এবং "পাথরের মূর্তির ঘর।" "নিচের তলার লাইব্রেরি" বলা হতো এই কারণে যে ঘরটিকে একটা পার্টিশন দিয়ে দুভাগে ভাগ করা হয়েছিল এবং ছোট দিকটাতে থাকত কিছু বুককেস এবং বইপত্র। আর "পাথরের মূর্তির ঘর" বলা হতো এই কারণে যে, তলস্তয় তাঁর ভাই নিকোলাইয়ের একটি আবক্ষ পাথরের মূর্তি তৈরি করিয়ে সে ঘরে রেখেছিলেন।

পার্টিশনের বৃহৎ অংশটিই ব্যবহার করতেন অতিথিবর্গ। বহু বিখ্যাত অতিথিগণ এ ঘরে রাত্রিযাপন করেছেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন তুর্গেনিভ, ফেট, চেকভ, রেপিন, কোরোলেনকো, স্ত্রাকভ, নেস্তারভ, স্তাসভ, তানিইয়েভ, পাস্তেরনাক, গে, মেস্নিকভ, উরুসভ এবং আরও অনেকে।

ঘরটির সাজসজ্জাও ছিল অন্যান্য ঘরগুলির মতোই। কিছু চেয়ার টেবিল, অতিথিদের জন্য শয়নের পালঙ্ক, আর পোর্ট্রেট।

এ ছাড়া তলস্তয়ের একটি কাস্কেটও এনে রাখা হয়েছিল তাঁর ভাই নিকোলাইয়ের মূর্তিটির পাশেই।

ইয়াসনাইয়া পোলিয়ানা শুধু রুশবাসী ও সাহিত্য অনুরাগীদের তীর্থস্থান নয়, এই বাড়িটি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেরও একটি তীর্থস্থান। সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী গুরুদেব হিসাবে যাঁকে গ্রহণ করে, যাঁর আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন, তিনি ঋষি তলস্তয়। এই বাড়ি থেকেই গান্ধী-তলস্তয় যোগাযোগ হয়েছিল। গান্ধীজীর লেখা ন'খানি পত্র এই ইয়াস-নাইয়া পলিয়ানায় ঋষি তলস্তয় গ্রহণ করেছিলেন ও তার জবাব দিয়েছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে যাঁরা প্রথম এই শতাব্দীর সেই সুদূর সূচনাকালে রুশদেশের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং সেকালেও ভারতে ও দুনিয়ার অন্যত্র মুক্তি সংগ্রামের ক্ষেত্রে রুশ দেশের ভূমিকার তাৎপর্য বুঝেছিলেন ও তার যথাযথ মূল্যায়ন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে গান্ধীজী ছিলেন অন্যতম প্রধান। তখন থেকেই ভারত ও রাশিয়ার জনগণের মধ্যে সম্পর্কের স্থাপনা ছিল তাঁর কাম্য। গান্ধীজী ও তলস্তয়ের মধ্যে মতাদর্শের মিল আজ সর্বজন বিদিত। তলস্তয়কে গান্ধীজী অভিহিত করেছিলেন শিক্ষাদাতা বলে; অপর পক্ষে গান্ধীজীকে তলস্তয় বলতেন আত্মিক দিক থেকে তাঁর আপনজন। ১৯২১ সালে একজন সাংবাদিকের এক প্রশ্নের উত্তরে কাউন্ট তলস্তয়ের সঙ্গে তাঁর (গান্ধীজীর) সম্পর্কের বিষয়ে গান্ধীজী উত্তর দেন, "একজন ভক্ত পাঠকের সম্পর্ক, যে তাঁর কাছে গভীরভাবে ঋণী।" এ. ভি. লুনাচরস্কি গান্ধীজীকে "ভারতীয় তলস্তয়" নামে অভিহিত করেন।

১৯০৯ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর এই ইয়াসনাইয়া পলিয়ানায় বসে সকালে ডাক দেখতে দেখতে লিও তলস্তয় সানন্দ বিস্ময়ে দেখলেন যে, এক তরুণ আইনজীবী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী তাঁকে চিঠি

লিখেছেন। তলস্তয়ের অচেনা সেই পত্রলেখক দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় শ্রমিকদের শোচনীয় অবস্থা এবং বর্ণবৈষম্য ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাদের কঠোর সংগ্রামের বিবরণ দিয়েছেন। ট্রান্সভালে (দক্ষিণ আফ্রিকা) প্রায় তিন বছর ধরে যেসব ঘটনা ঘটছে, তার দিকে তিনি তলস্তয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, সেই উপনিবেশের বাসিন্দা ব্রিটিশ ভারতের ১৩,০০০-এর মতো লোকের উপর বহুরকম বিধিনিষেধ চাপিয়ে দিয়েছে।

গান্ধী তলস্তয়কে জানিয়েছিলেন যে, ভারতীয়দের প্রতি বিভেদাত্মক ও অবমাননাকর ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ আইন পাশ হয়েছে। যাই হোক, ২,৫০০ ভারতীয় শ্রমিক 'কালাকানুন'এর কাছে নতিস্বীকার করার চেয়ে জেলে যাওয়াটাই শ্রেয় বলে মনে করেছে। জনসাধারণকে পীড়ন করা হচ্ছে, তাদের চাকরি ও বাসস্থান থেকে বিতাড়িত করা হচ্ছে এবং বন্দী করা হচ্ছে। কিন্তু হিংসা বা জবরদস্তির আশ্রয় না নিয়েই তারা কর্তৃপক্ষকে মানতে অস্বীকার করছে। গান্ধীজী লিখেছেন, এই সংগ্রাম এখনও চলছে এবং কবে-যে শেষ হবে বলা শক্ত। কিন্তু এটা অন্তত তাদের কয়েকজনকে বুঝিয়ে দেওয়া গেছে যে, যেখানে স্থূল বলপ্রয়োগ নিষ্ফল, সেখানে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ জয়ী হতে পারে এবং জয়ী হবেই। অচেনা পত্রলেখকের এই চিঠি তলস্তয়ের কৌতূহলকে জাগিয়ে তুলল। ভারত থেকে তিনি কিছু দুঃখজনক খবরও পেয়েছিলেন, যার উত্তরে তিনি লিখেছিলেন দীর্ঘ, ক্রুদ্ধ এক "ভারতীয়দের প্রতি পত্র", যেখানে তিনি ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীদের তীব্র নিন্দাবাদ করেছিলেন। দুদিন পরে, ২৬শে সেপ্টেম্বর গান্ধীজীর চিঠির উত্তরে তলস্তয় একটি বন্ধুত্বপূর্ণ চিঠিতে নিপীড়িত ভারতীয়দের প্রতি তাঁর সহানুভূতি জানিয়ে এবং মানবিক অধিকার অর্জনের সংগ্রামে তাদের সাফল্য কামনা করে লিখেছিলেন,

"আমি এইমাত্র আপনার অত্যন্ত কৌতূহলজনক চিঠি পেয়েছি, যা আমাকে গভীর আনন্দ দিয়েছে। ট্রান্সভালে আমার প্রিয় ভাই ও সহযোগীদের ঈশ্বর সহায়তা দিন।" তলস্তয় তাঁর "ভারতীয়দের প্রতি পত্রের" অনুবাদ ও প্রচারে গান্ধীজীর আগ্রহকে অনুমোদন করেন।

১৯০৯ সালের ১০ই নভেম্বর তিনি লিখেছেন যে, তাঁর মতে ট্রান্সভালে ভারতীয়রা তাঁদের সমকালীন ইতিহাসের মহত্তম সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন, বিশেষ করে যখন এই সংগ্রাম তার উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের পন্থা—দুদিক দিয়েই আদর্শ। গান্ধীজীর অপর একখানা চিঠির সঙ্গে তলস্তয় একটি বই পেলেন, ব্রিটিশ পাদ্রী জোসেফ আই ডাউন লিখিত "এম. কে. গান্ধী—দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় দেশপ্রেমিক।" গান্ধীজী লিখেছিলেন, এই বইটি তাঁর জীবনকে ধরতে পেরেছে এবং যে-সংগ্রামে তিনি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছেন তার উপর আলোকপাত করেছে। তলস্তয়ের আগ্রহ বাড়াবার জন্যে এবং তাঁর সমর্থন পাবার জন্যেই তাঁর গভীর ইচ্ছা এবং তিনি আশা করেন, তাঁর এই বই পাঠানোটাকে তলস্তয় অন্যায় আব্দার বলে মনে করবেন না। গান্ধীজী এবং তৎসম্পর্কীয় বই সম্বন্ধে টলস্টয় আরো আগ্রহী হলেন। সেটা এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, সমস্ত বই ছেড়ে তিনি এ বই অত্যন্ত সযত্নে পড়েছিলেন এবং মার্জিনে নোট লিখেছিলেন। পরদিন গান্ধীজীর চিঠির উত্তর দেবেন বলে তিনি ডেস্কের উপর একটি ইংরেজী পত্রিকার মধ্যে চিঠিটা রেখে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেদিনই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁর অজ্ঞাতে চিঠিটা সরিয়ে ফেলা হয় এবং পঞ্চাশ বছরের জন্যে চিঠিটা হারিয়ে যায়। পাঁচ মাস পর, ১৯১০ সালের এপ্রিলে, তলস্তয় ও গান্ধীজীর পত্রালাপ আবার আরম্ভ হয়, যখন গান্ধীজী তলস্তয়কে তাঁর তৃতীয় চিঠি এবং সেই সঙ্গে তাঁর

রচিত ইংরেজী বই "ভারতে স্বায়ত্তশাসন" পাঠান। গান্ধীজী তলস্তয়কে বইটি পড়ে দেখতে বলেন এবং তার সম্বন্ধে মতামত জানতে চান। গান্ধীর নতুন চিঠি এবং বিশেষ করে ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের উপর তার বই ভারতীয় জনগণের ভাগ্যের উপর তলস্তয়ের মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত করে। তিনি ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করেন, 'আজ সন্ধ্যায় আমি গান্ধীর বই পড়েছি…… ভারি চমৎকার।' 'গান্ধীর উপর বই পড়ছি। খুব দরকারী। আমি অবশ্যই তাঁকে চিঠি লিখব।'

অসুস্থতার দরুন তাঁর ইচ্ছাকে তিনি কাজে পরিণত করতে পারেন নি, কিন্তু বইটির প্রশংসাসূচক একটি ছোট নোট তিনি লেখেন, "গভীরতম আগ্রহের সঙ্গে আমি আপনার বই পড়েছি। আমি একটু ভালো হয়ে উঠলেই আপনাকে লিখব।" বইগুলি তাঁকে এতো প্রভাবিত করে যে, তলস্তয় তাঁর বন্ধু পি. এ. বুলেঞ্জারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাকালে গান্ধীজী সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করেন। ১৯১০-এর গ্রীষ্ম ও শরৎকালে গান্ধী ও তলস্তয়ের মধ্যে শেষ পত্রালাপ হয়। ৬ই সেপ্টেম্বর তিনি গান্ধীজীকে একটি দীর্ঘ চিঠি পাঠান, যেখানে তার পন্থা 'প্রেমের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা'র অনুকূলে যুক্তি দেন। পরিশেষে, তলস্তয় সেই প্রশ্নগুলির উল্লেখ করেন, যেগুলি গত কয়েক বছর ধরে তাঁর মনকে আলোড়িত করেছে—লুণ্ঠনমূলক যুদ্ধ এবং ঔপনিবেশিক দস্যুতা। গান্ধীজীকে লেখা এই ছিল তাঁর শেষ চিঠি। আড়াই মাস পর তলস্তয় প্রয়াণ করেন। জবাব দেবার কোন সুযোগ গান্ধীজীর হয় নি।

আমৃত্যু গান্ধীজী তলস্তয়কে তাঁর শিক্ষাগুরু বলে মানতেন। ১৯২৫ সালে তাঁর আত্মজীবনী "সত্যের সন্ধানে" বইতে তিনি

লিখেছেন, "আমার সমসাময়িকদের মধ্যে তিনজন আমার জীবনের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করেন: রাইচাঁদ ভাই, তাঁর সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ সম্পর্কের দ্বারা, তলস্তয়, তাঁর 'ঈশ্বরের রাজত্ব আমাদের হৃদয়ে' বইয়ের দ্বারা এবং 'লাস্ট রুবিকন' বইতে রাসকিন। তাছাড়া আমি তলস্তয়ের রচনাবলী আদ্যোপান্ত পাঠ করি। 'সংক্ষিপ্ত নীতিগুচ্ছ', 'কর্তব্য কি' এবং অন্যান্য বইয়েরও যথেষ্ট প্রভাব আমার উপর পড়ে। আমি আরো প্রবলভাবে অনুভব করতে পারি সর্বাঙ্গীণ প্রেমের অসীম সুযোগ।" ভারতীয় পণ্ডিতদের মতে, ১৮৯৩ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাসের প্রথম বছরে ২৫ বছর বয়সে গান্ধীজী প্রথম তলস্তয়ের রচনা পাঠ করেন। এর ফল স্বভাবতই দেখা যায় প্রিটোরিয়ায় তাঁর প্রথম ভাষণে। সেখানে তলস্তয়ের আদর্শানুযায়ী তিনি ভারতীয় শ্রমিকদের সমস্ত ব্যক্তিগত অপমান ভুলে তাদের অধিকার অর্জনের জন্যে সম্মিলিত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে এক হতে বলেন। ১৯১৩ সালে, যখন লেখকের পাণ্ডুলিপি নিয়ে তলস্তয়ের স্ত্রী ও তাঁর কনিষ্ঠ কন্যার বিরোধ তীব্র হয়ে উঠলো, সেই জটিল প্রশ্নে নিজের মতামত জানিয়ে গান্ধীজী এস. এ. তলস্তয়াকে একটি চিঠি লেখেন।

তলস্তয়ের মৃত্যুর পর প্রায় চল্লিশ বছর গান্ধীজী জীবিত ছিলেন। সমগ্র জীবন তিনি তলস্তয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, তাঁর সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধার অনুভূতি বজায় রেখেছিলেন। তলস্তয় ও গান্ধীজীর বন্ধুত্ব স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল। কিন্তু দুই চিন্তাবিদের মধ্যে এই স্বল্পস্থায়ী বন্ধুত্ব বা সঙ্গ ফলপ্রসূ হয়েছে। "তলস্তয়ের প্রতি এশিয়ার উত্তর"- রচনায় রোমাঁ রোলাঁ লেখেন: "মৃত্যুপথযাত্রী তলস্তয়ের হাত থেকে ভারতীয় তরুণ গান্ধী সেই স্বর্গীয় আলোক গ্রহণ করেন, যা বৃদ্ধ রুশী ঋষি তাঁর হৃদয়ে লালন করেছিলেন, তাঁর প্রেম দিয়ে উত্তপ্ত রেখেছিলেন, নিজের বেদনা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন; গান্ধী

তা থেকে আলোকবর্তিকা জ্বালিয়েছিলেন, যা ভারতকে আলোকিত করেছিল : এই আলোর প্রতিফলন পৃথিবীর সর্বত্র বিকীর্ণ হয়েছে।”

আমরা সেই ঘরটি দেখলাম, যে-ঘর থেকে আশী বছর বয়সে স্ত্রীর উদ্দেশ্যে একখানা পত্র লিখে তলস্তয় ১৯১০ সালের ২৮শে অক্টোবর রাত্রে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান। কল্পনা করতে বিস্ময় লাগে ষাট বছরের দাম্পত্য জীবন, ১৩টি সন্তান গর্ভে ধারণ করে যে স্ত্রী খেয়ালী স্বামীর সব চাহিদা পূরণ করেছিলেন, স্বামীর সেবায় যাঁর কখনও ক্লান্তি আসেনি, যাঁর হাতের লেখা একমাত্র নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য কেউ পাঠোদ্ধার করতে পারতো না, যাঁকে স্বামীর পাণ্ডুলিপি একবার নয়, দশবার পর্যন্ত কপি করে দিতে হতো, (“ওআর অ্যাণ্ড পীস্” দশবার কপি করতে হয়েছিল শ্রীমতী তলস্তয়কে), তাঁকে ছেড়ে গেলেন পত্র লিখে এই কথা বলে, “তোমার সঙ্গে আর ঘর করা সম্ভব নয়, তাই সব ছেড়ে চলে যাচ্ছি।” অক্টোবরের শেষ, বরফজমা ঠাণ্ডা, শীতের রাত্রে খেয়ালী ভাবুক ঋষি তলস্তয় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন সঙ্গে বন্ধু ডাঃ মায়াকোভস্কি। ৭ই নভেম্বর আস্তাপভো স্টেশনের প্লাটফরমে মারা গেলেন মনীষী তলস্তয়। স্টেশনের সমবেত মানুষরা কেউ কিন্তু জানতো না মৃত ব্যক্তি কে। ডাঃ মায়াকোভস্কি অবশেষে প্রকাশ করলেন মৃত ব্যক্তি ঋষি তলস্তয়। তারপর একটা বিশেষ আধারে করে তলস্তয়ের দেহ নিয়ে আসা হ'ল ইয়াসনাইয়া পলিয়ানায়। ৯ই নভেম্বর সমস্ত দিন রাখা হ'ল এই বাড়ির সামনে। যেখানে তলস্তয়ের দেহ রাখা হয়েছিলো সেখানে স্থাপিত হয়েছে তলস্তয়ের একটি “আবক্ষ মূর্তি”। তলস্তয়ের দেহ সমাধিস্থ করা হয় তলস্তয় ভবনের অদূরে—“টারিজাকাজ” উপবনে। পাশেই বয়ে যাচ্ছে একটি ঝর্ণাধারা। নিজের সমাধির জন্যে এই জায়গাটি তিনি নিজেই নির্বাচিত করে রেখেছিলেন। নির্জন বনানীর

ঝর্ণাধারার পাশে এই স্থানেই শিশুকালে খেলা করতেন ভাই নিকোলাইয়ের সঙ্গে। অনেকগুলি গাছে ঘেরা স্থান, তারই একটি গাছের গোড়ায় তলস্তয়ের সমাধি। ইট নয়, সিমেন্ট নয়, পাথর নয়, শুধু মাটি, তার উপরে ঘাস আর সেই ঘাসের উপর জমেছে বরফ; সেই বরফের উপর নেমে পড়ছে গাছের পাতা। ধারে কাছে সম্ভবত দু' এক মাইলের মধ্যেও কোনো বসতি নেই। নেই কোনো মনুষ্য চলাচলের রাস্তা বা যানবাহন। এতো নির্জন যে গাছের পাতা ঝরার শব্দটিও অনুভব করা যায়। শুধু শোনা যায় কিছু পাখির কল-কাকলী। শান্তির কবি, শান্তির সাধক ঋষি তলস্তয় চিরশান্তিতে এখানে রয়েছেন চিরনিদ্রায়।

ইয়াসনাইয়া পলিয়ানা ছেড়ে আসবো, গাইড্ মহিলা এস্টেটের গেট পর্যন্ত আমাদের বিদায় জানাতে এলেন। আমার সঙ্গে ছিল আমার "যুদ্ধ ও স্বাধীনতা" বইখানি। গাইড্ মহিলার হাতে বইখানি তুলে দিয়ে বললাম, ঋষি তলস্তয়ের গ্রন্থাগারে বিশ্বের বহুভাষায় বই রয়েছে। তাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষা বাংলা ভাষার লেখা এই বইখানি দিয়ে গেলাম। বইখানির নাম ইংরেজীতে ব্যাখ্যা করে দেওয়াতে গাইড্ মহিলা আরো খুশী হলেন। বললেন, এই বইখানি তলস্তয় মিউজিয়ামে রক্ষিত থাকবে।

ঘড়ির কাঁটায় সময় চলে। এগিয়ে চলে কর্মসূচী। ঠাসা কর্মসূচীর মধ্যে কেমন যেন নিজেকে অসহায়ের মতো ছেড়ে দিতে হয়। আমরা বাঙালী একটু ঢিলে-ঢালা, এড়িয়ে-গড়িয়ে চলা আমাদের স্বভাবের ধর্ম। কিন্তু সে উপায় নেই। ঠিক সময় মতো আনাতোলে এসে হাজির হবে এবং শুরু হবে কর্মসূচী। আনাতোলে এসে যদি দেখে আমরা প্রস্তুত হই নি, তবে

আনাতোলে কিছুই বলবে না, নিজেদেরই লজ্জা করবে। আমাদের কর্মসূচীর সাথে আরো অনেকের কর্মসূচী বাঁধা আছে। তাই আমরা দেরী করলে অন্য ব্যক্তিদেরও কাজের ক্ষতি হবে। এটা ভেবেই সবসময় নিজেদের প্রস্তুত রাখবার চেষ্টা করতাম। শত চেষ্টা করেও দেখেছি, ঠিক ঠিক কর্মসূচী মেনে পরপর বিশ-পঁচিশ দিন চলা আমাদের পক্ষে একটু কষ্টকরই বটে। হাজার হলেও আমরা হলাম "নটার গাড়ি ক'টায় ছাড়ে" হিসেব করার দেশের লোক। রাশিয়াতে এই সময়-সূচী মেনে চলা, সময়ের-কাজ সময়ে করা, এটা বোধ হয় ওঁদের রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। ট্রেন, মেট্রোরেল, প্লেন এমন কি বাস-ট্রামও পর্যন্ত চলে ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে। হাজার মাইল ট্রেনে ভ্রমণ করেও দেখেছি, হাজার হাজার মাইল বিমানে ভ্রমণ করেও দেখেছি, ঘড়ি আর কাজ অভিন্ন। রাস্তা-চলা মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে অবাক হতে হয়, ছেলে অথবা মেয়ে, প্রৌঢ় অথবা যুব, কেউ যেন আস্তে চলতে জানে না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে খোশ মেজাজে গপ্প করছে এমন দৃশ্য কদাচিৎই চোখে পড়ে। আবার কাজের সময়টি পেরিয়ে গেলে এই লোক-গুলোকে যখন কাফে, রেস্তোরাঁ বা পার্কে দেখি তখন মনে হয় এদের জীবনে বুঝি অখণ্ড অবসর। হোটেলে বাইরে থেকে যখনই ফিরে এসেছি তখনই দেখেছি আমাদের বিছানা, জামা-কাপড় সব একেবারে টিপ্‌টপ্‌ করে সাজানো। কোন সময়েই কখন অথবা কে এই ঘর পরিষ্কারের কাজটি করতেন সেটা দেখতে পেতাম না। এক ঘণ্টার জন্যেও বাইরে গিয়ে ফিরে এসে দেখেছি আমাদের ঘরটি নতুন করে গুছিয়ে রেখে যাওয়া হয়েছে। একদিন তাঁর দেখা পেলাম। বেশ বয়স্কা একজন মহিলা। অনেকক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন অবশেষে যখন বুঝলেন, আমি এক্ষুণি ঘর থেকে বেরুচ্ছি না, তখন কলিংবেল টিপলেন। আমি

ইশারা করে বললাম, তিনি ঘরে আসতে পারেন, ঘর পরিষ্কার করতে পারেন, আমার কোন অসুবিধা হবে না। পরে এই মহিলার সঙ্গে আরো বেশী আলাপ হয়েছে। আগে অন্য চাকরি করতেন, সেই চাকরি থেকে অবসর নেবার পর এই হালকা ধরনের কাজ নিয়েছেন। ছেলে-মেয়েরা চাকরে। যে যার কর্মস্থলে থাকে, স্বামী নেই, তাই নিজের ঘরের কাজ শেষ করে অঢেল সময় পড়ে থাকে, সেই সময় কাটাবার জন্যে এই চাকরি। আগে ছিলেন বাস-ড্রাইভার। রাশিয়ায় মহিলারা করেন না এমন কোনও কাজ নেই। কোদাল-বেলচায় ক্ষেত-খামারের কাজ থেকে শুরু করে মহাকাশ অভিযানে মহিলারা পুরুষের ভাগিদার। হোটেল-রেস্তোরাঁতে যখন দেখতাম সুন্দর সুদর্শন সুপুরুষ ছেলেগুলি খাদ্য পরিবেশন করছে আর পথে মেয়েরা বাস-লরি-ট্রাক চালাচ্ছে, তখন মনে হতো ছেলেরা বুঝি এখানে হেরে গেছে।

ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ করেছি, বাস-ড্রাইভার হিসেবে কেমন কাজ করতেন, কেমন ছিলো কাজের ধারা, ছেলে-মেয়েদের কাজের তফাৎ কি ইত্যাদি ইত্যাদি। ভদ্রমহিলা জানিয়েছেন রাশিয়ায় একজন বাস ড্রাইভার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষকের বেতন সমান। কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু বেশী। একদিন বেশী কাজ করলে পরদিন ছুটি। যদি কেউ কোন দিন মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান করেন এবং পরদিন কাজের আগে ডাক্তারি পরীক্ষায় যদি ধরা পড়ে, তাকে কিছুতেই কাজে যোগ দিতে দেওয়া হবে না। প্রতিদিন কাজের আগে বাস ড্রাইভারদের রক্ত চাপ পরীক্ষা করা হবেই। ভদ্রমহিলা হেসে বলেছিলেন, এ ব্যাপারে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা বেশী নির্ভরযোগ্য। বিশু দাশগুপ্ত নামে উপরি পাওনা একটি বন্ধুকে মস্কোয় পেয়েছিলাম। বিশু কলকাতা থেকে ঘটনাচক্রে মস্কো গিয়ে একটি ডক্টরেট

মেয়েকে বিয়ে করেছে। বিশু নিজে ক্যামেরাম্যান। এই বিশুর মাধ্যমেই আমি রাশিয়ায় ঘর পরিষ্কারের মহিলা থেকে শুরু করে অন্য অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপের সুযোগ পাই।

আজ ১২ই নভেম্বর চললাম রেড স্কোয়ার ও ক্রেমলিন দেখতে। প্রায় সমস্ত দিনটা কাটলো রেড স্কোয়ার ও ক্রেমলিন দেখে।

রেড স্কোয়ার বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে আসছে। রেড স্কোয়ার বহু আন্দোলন, যুদ্ধবিগ্রহ এবং রক্তপাতের প্রতীক স্বরূপ। ১৯১৮ সালের ১২ই মার্চ লেনিনের নির্দেশে ক্রেমলিনে লাল ঝাণ্ডা উত্তোলন করা হয়। লাল রং সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় পতাকার রং পায়। এই রেড স্কোয়ার থেকেই লেনিন সামাজিক বিপ্লব, স্বাধীনতা সংগ্রাম, বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ থেকে সোভিয়েত ভূমিকে রক্ষা করার সংগ্রাম চালান; সর্বোপরি একটি কমিউনিস্ট সমাজ গড়ে তোলবার জন্যে বিভিন্ন বক্তৃতার মাধ্যমে জনগণকে উদ্‌বুদ্ধ করেন এবং অনুপ্রেরণা প্রদান করেন।

বিশ্বের অনেকের কাছে রেড স্কোয়ার পৃথিবীর সুন্দরতম দ্রষ্টব্য স্থলগুলির মধ্যে একটি। ১৭শ' শতাব্দীতে স্কোয়ারটি রাশিয়ান ভাষায় এর নিজের নাম পায় "ক্র্যাস্‌নায়া" যার অর্থ সুন্দর। স্থাপত্য শিল্প-সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে রেড স্কোয়ার ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগলো এবং ১৯শ' শতাব্দীর শেষের দিকে সম্পূর্ণ রূপায়িত হ'ল। ১৫৬১ সালে জার ইভান দি টেরিব্‌ল-এর রেড স্কোয়ারের দিকে কাজান এবং অ্যাসট্রাখান-এর খ্যানেদের ওপর রাশিয়ানদের বিজয়ের স্মারক হিসাবে ক্যাথিড্রাল স্থাপন করলেন। এই টেম্পল যা রাশিয়ানদের স্থাপত্য শিল্পের প্রকৃষ্ট নিদর্শন, আসলে "ক্যাথিড্রাল অব দি ইন্টারসেশন" নামে পরিচিত। তিনশত বৎসর ধরে স্থপতির নাম প্রায় সবাই বিস্মৃত হয়েছিলেন। তবে ১৮৯৬ সালে কিছু

পুরাতন নথিপত্র থেকে আবিষ্কৃত হয় যে, দুজন রাশিয়ান স্থাপত্য-শিল্পী—পোস্টনিক এবং বার্মা এই বিশাল স্থাপত্য-শিল্পের তথাকথিত রূপকার। কিন্তু ১৯৫৭ সালে অন্যান্য পুরানো নথিপত্র থেকে প্রকাশ পায় যে, উক্ত পোস্টনিক এবং বার্মা এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। তাঁর নাম পোস্টনিক ইয়াকোভ্‌লেভ্‌ ; ডাক নাম বার্মা।

১৫৮৮ সালে ক্যাথিড্রালের পর একটি ক্ষুদ্র চ্যাপ্‌ল্‌ নির্মিত হয়, যা ভ্যাসিলির সমাধির ওপর অবস্থিত। "ক্যাথিড্রাল অব দি ইণ্টারসেশনকে" 'টেম্পল অব ভ্যাসিলি দি ব্লেস্‌ড' অথবা 'সেণ্ট ব্যাসিল্‌স্‌' নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। ক্যাথিড্রাল অব দি ইণ্টারসেশন সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত রাশিয়ান রূপকার লিখেছেন—'St. Basils put me in such a romantic mood that I almost expected to see a 'boyar' in a long homes-pun coat and fur hat to pass by.'

সেণ্ট ব্যাসিল্‌সের দক্ষিণে উঠেছে "স্প্যাস্কি টাওয়ার", ক্রেম-লিনের প্রধান সৌধ, যা এখন মস্কোর প্রতীক। ১৪৯১ সালে ইতালির স্থপতি মিলানের পিয়েত্রো সোলারি-র অধীনে বিশিষ্ট কারিগর দিয়ে এই সৌধটি নির্মিত হয় ; কিন্তু ১৬২৫ সালে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করে। স্প্যাস্কি-গেট্‌ অতিক্রম করেই গীর্জার সারি ; জারেরা, সম্রাটগণ এবং বিদেশী রাষ্ট্রদূতগণ এই গেট দিয়ে ক্রেমলিনে প্রবেশ করতেন।

১৪৯১ সালে সর্বপ্রথম একটি ঘড়ি "স্প্যাস্কি টাওয়ারে" বসানো হয়। ১৮৫২ সালে ১৮শ' শতাব্দীর দশটি ঘণ্টা-বিশিষ্ট ঘড়ি ক্রেমলিন-টাইম্‌স-এ বসানো হয়। ঘড়ির সম্মুখভাগের ব্যাসার্ধ ২১ ফুট। প্রতিটি সংখ্যা ২·৪ ফুট উঁচু। ঘণ্টার কাঁটা ৯·৮ ফুট লম্বা এবং মিনিটের কাঁটা ১০·৮ ফুট লম্বা। ওজন ছিল ২৫ টন। ১৯১৭ সালে ক্রেমলিনে যে আন্দোলনের ঝড় ওঠে, সেই

ঝড়ে ঘড়িটা ধ্বংস হয়। পরবর্তী কালে লেনিনের নির্দেশে এগুলিকে সংরক্ষণ করা হয়। বর্তমানে ক্রেমলিন টাইম্‌স্‌ প্রতিদিন মস্কো বেতারে সংবাদ প্রেরণ করছে।

ক্যাথিড্রালের বাম দিকে এবং রেড স্কোয়ারের পশ্চাৎদিকে ইওরোপের বৃহত্তম হোটেল "রাশিয়া" স্থপতি চেকলিন কর্তৃক গড়ে ওঠে। এই হোটেলে ৩,২০০ স্বয়ংসম্পূর্ণ কামরা এবং ৬,০০০ লোকের বসবার ব্যবস্থা আছে। পরিব্রাজকদের সুবিধার্থে এখানে শীততাপ নিয়ন্ত্রণ, ভ্যাকুয়াম ক্লিনিং এবং অন্যান্য বৈদ্যুতিক স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা করা আছে। হোটেলটিতে পাঁচটি রেস্তোরাঁ আছে যার দুটিতে ৭০০ লোকের বসবার জায়গা আছে এবং ২৭টি কাফে ও স্ন্যাক-বার আছে। ৯.৯ একর জমি জুড়ে এই হোটেল। হোটেলের বাগানে একটি রঙ্গমঞ্চ আছে, আসনসংখ্যা ৩,০০০। মস্কোভা নদী সামনে রেখে "জ্যারিয়াদিয়ে" (Zaryadye) সিনেমা হল।

রেড স্কোয়ারের অপর প্রান্তে লাল ইঁটের তৈরী অট্টালিকাটি হ'ল "স্টেট মিউজিয়ম অব হিস্টরী"—১৮৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত। ১৭৫৫ সালে মিখাইল লোমোনস্‌ভ কর্তৃক মস্কো ইউনিভার্সিটি স্থাপিত হয়। মিউজিয়ামের বাম দিকে ১৪৯১ সালে পিয়েত্রো আন্তনীয় সোলারি কর্তৃক তিন-চাকা বিশিষ্ট সুষমামণ্ডিত নিকোলস্কি টাওয়ার নির্মিত হয়। এই টাওয়ারটি ২৩২ ফুট উঁচু। রেড স্কোয়ারের কেন্দ্রস্থলে "লেনিন মসোলিয়াম" অবস্থিত। স্থপতি আলেক্‌সি স্কুশেভ্‌ (Alexei Shchusev) এর নক্‌সা নির্মাণ করেন। যে-সব দিন মসোলিয়ামটি জনগণের জন্যে খুলে দেওয়া হয়, সেই সব দিনে বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন বয়সের লোকেরা ধৈর্য সহকারে আলেকজাণ্ডোভস্কি গার্ডেনের ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকে মসোলিয়ামের দিকে; আবহাওয়া যাই থাকুক না কেন।

ক্রেমলিনের দেওয়ালের এককোণে একটি সাধারণ সমাধিক্ষেত্র আছে। ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে, যে সকল কর্মী এবং সৈন্য সোভিয়েত শক্তির হয়ে লড়েছিলো এটি তাঁদের। ক্রেমলিনের বিপরীত দিকে কাঁচের জানলা বিশিষ্ট দ্বিতল অট্টালিকাটি হচ্ছে মস্কোর বৃহত্তম বিভাগীয় ভাণ্ডার—GUM. ১৯১৭ সালের আগে এই ভাণ্ডারে ২০০টি ছোট দোকান ছিল। এখন বছরে প্রায় ৮ কোটি ৫০ লক্ষ ক্রেতা GUM-এ তাঁদের মালপত্র ক্রয় করেন। রেড স্কোয়ারের এককোণে GUM-এবং "মিউজিয়ম অব্ হিস্টরী"র মাঝখানে প্রাদেশিক প্রশাসনিক দপ্তর অবস্থিত।

১৯৪১ সালে যখন জার্মান নাজিরা মস্কোর দিকে অগ্রসর হয়, তখন ৭ই নভেম্বর সমাজতান্ত্রিক অক্টোবর মহাবিপ্লবের বার্ষিকীকে উপলক্ষ করে মস্কোতে মিলিটারী প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৫ সালের ২৪শে জুন "নাজি জার্মানী"র পরাজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে একটি জয়-সূচক প্যারেড্ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতিবছর ১লা মে এবং ৭ই নভেম্বর রেড স্কোয়ারে মিছিল এবং মিলিটারী প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়। এই দুটি দিন জাতীয় ছুটির দিন হিসেবে চিহ্নিত। রেড স্কোয়ারে জনগণ তাঁদের বীরদের, প্রথম নভোশ্চর য়ুারী গ্যাগারিন এবং ভ্যালেন্তিনা তেরেস্কোভা-কে স্বাগত জানায়। প্রতিবছর জুন মাসে সেকেণ্ডারী স্কুলের গ্র্যাজুয়েট-দের রেড স্কোয়ারে রকমারী ফুল দিয়ে সাজানো আনন্দোৎসবের মধ্যে দিয়ে "গ্র্যাজুয়েট-বল্" প্রদান করা হয়। প্রাচীন এই রেড স্কোয়ার তখন ভোর না হওয়া পর্যন্ত আনন্দপুরীর রূপ পরিগ্রহ করে।

এক প্রস্থ দেখার পর আনাতোলে বললো, "চলুন কিছু খেয়ে আসা যাক।" খেতে এলাম পিকিং-রেস্তোরাঁয়। মস্কোতে চীনাবাসী কতজন আছেন জানি না এবং মস্কোবাসীর পিকিং

সম্পর্কে মনোভাব কারও অজানা নয়। কিন্তু দেখলাম পিকিং রেস্তোরাঁ সম্পর্কে মানুষের প্রীতির কিছু ঘাটতি নেই। পিকিং রেস্তোরাঁয় অবশ্য কয়েকটি চীনা শিল্প-কলা ও ছবি ছাড়া কিছু নেই। জলযোগ সেরে আবার ফিরে এলাম রেড স্কোয়ারে ; এবার দেখা শুরু হলো ক্রেমলিন।

মস্কো সফর শেষে বেলজিয়ান কবি এমিল ভারহেরেন মন্তব্য করেছেন, "সমস্ত শহরটিকে মনে হয় প্রচুর মুক্ত বায়ুর নীচে একটি জাদুঘর এবং সম্পূর্ণতম, সুন্দরতম, সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় দৃশ্য এই ক্রেমলিন।" মস্কোর ঐতিহাসিক শহর ক্রেমলিনেই "বরোভিট্স্কি হিল্" তথা ক্রেমলিন হিল-এর অবস্থান। ১২৩৮ সালে তাতারদের আক্রমণে ক্রেমলিন দুর্গ ভস্মীভূত করে দেওয়া হয়। কিন্তু মস্কো বেঁচে যায় এবং বর্ধিত হতে থাকে। ১৩২৯ সালে ক্রেমলিনের চারিধারে ওক কাঠের প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। ঐ সময় দুটি প্রস্তর নির্মিত "ক্যাথিড্রাল" নির্মিত হয়: একটি "আর্কঅ্যাঞ্জেল ক্যাথিড্রাল" এবং অপরটি "ক্যাথিড্রাল অব দি অ্যাজাম্পশন্"। ১৩৬৮ সালে এই ওক কাঠের প্রাচীরটিই শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত দেওয়াল ও টাওয়ারের রূপ নেয় এবং মস্কো শ্বেত-প্রস্তর নির্মিত শহর নামে পরিচিতি লাভ করে।

১৩৮২ সালে তাতার খান তখ্তামিশ্ যাযাবর সম্প্রদায়ের একটি দলকে নিয়ে ক্রেমলিনের গেট দিয়ে বিশ্বাসঘাতকের মতো ঢুকে পড়ে। দুর্গের ক্ষতি সাধন করে, গীর্জাগুলি লুঠ করে এবং সবকিছু ভস্মীভূত করে দেয়। প্রায় অর্ধেক নিরপরাধ লোককে হত্যা করে। তৃতীয় ইভানের আমলে সেই ক্ষতিগ্রস্ত ক্রেমলিনের সীমা ও শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত দেওয়াল বর্ধিত করা হয়, যা ব্যাপক

অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয়েছিলো। ১৪৯৫ সালে নতুন ইটের প্রাচীর এবং টাওয়ারগুলি আগের অবস্থায় ফিরে আসে। তৃতীয় ইভানের নির্দেশে ইতালীয় শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য শিল্পিগণ মস্কোতে কাজ করবার জন্যে আমন্ত্রিত হন। ১৮শ' শতাব্দী ক্রেমলিনের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় বলে চিহ্নিত। ১৭২২ সালে রাজধানী মস্কো থেকে সেন্ট পিটার্সবার্গ-এ স্থানান্তরিত করা হয়। ক্রেমলিন জারদের অস্থায়ী আবাসে পরিণত হয়। রাশিয়ান সম্রাটগণ এখানে এসে পূর্বপুরুষদের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেন এবং ক্রেমলিনের উন্নতি কামনা করতেন। ১৭৩৭ সালে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড কাঠের সমস্ত বাড়িগুলিকে ভস্মীভূত করে ফেলে ; যা এখনও ক্রেমলিনে দাঁড়িয়ে আছে। ১৮১২ সালেও ক্রেমলিন একটা সংকটের মুখে পড়ে। ঐ বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে নেপোলিয়নের সেনাদল মস্কো শহরের মধ্যে প্রবেশ করে ; মস্কো সেখানকার অধিবাসী এবং সৈন্যদ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলো। ফরাসী সৈন্যরা এক মাসের জন্যে ক্রেমলিনে তাঁবু গাড়লো। মস্কো ছেড়ে যাবার প্রাক্‌কালে নেপোলিয়নের নির্দেশমতো তারা ক্রেমলিনকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু শহরের লোকেরা তাদের সেই প্রচেষ্টায় বাধা প্রদান করে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাশিয়ার জনগণ প্রচুর জ্বলন্ত সামগ্রী উদ্ধার করে। ১৮১২ সালের স্বদেশী আন্দোলনের পর সমস্ত ঐতিহাসিক সৌধগুলিকে ক্রেমলিনে সংরক্ষিত করা হয়। ১৯শ শতাব্দীতে নতুন অবয়ব সংযোজিত হয় "গ্র্যাণ্ড প্যালেস্" এবং "নতুন আর্মারী বিল্‌ডিং"।

১৯১৮ সালের ১১ মার্চ সোভিয়েত সরকার পেত্রোগ্রাদ থেকে মস্কো চলে আসেন। প্রাচীন মস্কো বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের রাজধানীতে রূপান্তরিত হয়। ১৯১৮ সালে লেনিন একটি নির্দেশনামায় স্বাক্ষর করেন। কলা এবং শিল্প সৌধগুলি সংরক্ষণের

ব্যবস্থাকল্পে এতে বলা হয়, "সুন্দরকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে মডেল হিসাবে—যতই পুরাতন হোক।" এরপর ক্রেমলিনের সংরক্ষণ শুরু হয়। ১৯৭৩ সালে ম্যাসিভ্ রুবী স্টার্স পাঁচটি সুউচ্চ সৌধ ক্রেমলিনের ওপর নির্মাণ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৫ সালে ক্রেমলিনে বৃহদাকারের সংরক্ষণের কাজ শুরু হয়। ১৯৫৫ সালের মধ্যে সমস্ত ক্যাথিড্রালগুলি এবং "স্টেট্ হল" সম্পূর্ণভাবে মেরামত করা হয়। প্রাচীন প্রস্তর নির্মিত "ক্যাথিড্রাল স্কোয়ার"কে সংরক্ষণ করা হয়। ক্রেমলিন এখন শুধু রাশিয়ার অর্থ ভাণ্ডার বা কৃষ্টির সামান্য অংশ বিশেষ নয়; সোভিয়েত সরকারের প্রশাসন এবং পার্লামেন্ট ভবনও বটে। ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে ক্রেমলিনকে জনগণের জন্যে খুলে দেওয়া হয়। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা হাজার হাজার মস্কোবাসী এবং পরিব্রাজক এখানে আসেন ও পথ খুঁজে নেন। ত্রৈৎস্কি (ট্রিনিটি) টাওয়ারকে সুদৃশ্য পর্যবেক্ষণের প্রথম ধাপ বলে অভিহিত করা হয়। ১৬শ' শতাব্দীর গোড়ার দিকে শ্বেত প্রস্তর নির্মিত "কুতাফিয়া টাওয়ার" নির্মিত হয়। ১৯৪৫ সালের দিকে ত্রৈৎস্কি টাওয়ার গড়ে ওঠে। এই টাওয়ারটি ক্রেমলিনে অবস্থিত টাওয়ারগুলির মধ্যে সর্বোচ্চ। এর চূড়াটি ২৬৪ ফুট উঁচুতে অবস্থিত। প্রথম পিতর-এর নির্দেশে ১৭৩৬ সালে নির্মিত অস্ত্রাগারটি স্থাপত্য শিল্পের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ১৯১৮ সালের মার্চ মাস থেকে এটি সোভিয়েত সরকারের অধীনে আসে। ভি. আই. লেনিন ১৯১৮ সালের মার্চ মাস থেকে এই অস্ত্রাগারে বসবাস এবং কাজকর্ম করে গিয়েছেন ১৯২৩ সালের মে মাস পর্যন্ত। কংগ্রেস প্রাসাদের ঠিক পশ্চাৎ দিকে দক্ষিণপাশে ১৬৫৬ সালে নির্মিত হয় "ক্যাথিড্রাল অব দি টুয়েল্‌ভ অ্যাপস্‌ল্‌স্" এবং "প্যালেস্ অব দি প্যাট্রিয়ার্ক"। "ক্যাথিড্রাল অব দি টুয়েল্‌ভ অ্যাপস্‌ল্‌স্"-এর সম্মুখে বিশ্ববিখ্যাত কামানটি

অবস্থিত ; যা ১৬শ' শতাব্দীর মিলিটারী এনজিনিয়ারিং-এর এবং নির্মাণ শিল্পের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ১৫৮৬ সালে বিশ্বের সেরা এই কামানটি নির্মাণ করেন আঁদ্রে চোখভ্। ১৭ ফুট দীর্ঘ এবং ৩৫ ইঞ্চি ব্যাসার্ধের এই কামানটির ওজন ৪০ টন। এই কামানটিকে কখনও ব্যবহার করা হয়নি।

স্প্যাস্কি টাওয়ারের দক্ষিণদিকে তাজারস্কি টাওয়ার গড়ে উঠেছে। ১৬৮০ সালে তাঁবুর আকৃতি নিয়ে এটি নির্মিত হয়। এর দক্ষিণ দিকে কিছুটা পিছনে "মস্কোভরেৎস্কি টাওয়ার" ১৪৮৭ সালে মার্কো রুফো কর্তৃক নির্মিত হয়। এই টাওয়ারটির উচ্চতা ১৫২ ফুট। ক্রেমলিনের কেন্দ্রস্থলে ১৬শ' শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা লক্ষ্যণীয় "বেল্‌ফ্রী অব ইভান দি গ্রেট" রাখা আছে। বেল্‌ফ্রীর নীচেই "জার বেল" (ঘণ্টা) এর অবস্থান। বিশ্বের বৃহত্তম এই বেল্‌টির ওজন ২০০ টন, উচ্চতা ২০ ফুট এবং ব্যাসার্ধ ২২ ফুট। বেল্‌ফ্রীর সম্মুখ দিকে "ক্যাথিড্রাল স্কোয়ার" অবস্থিত। ১৪শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে মস্কোর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এই স্কোয়ারটি রূপ লাভ করে। ১৪৭৯ সালে ক্যাথিড্রাল স্কোয়ারের উত্তর দিকে "ক্যাথিড্রাল অব দি অ্যাজাম্পশন" নির্মিত হয়। শ্বেত প্রস্তর নির্মিত এই ক্যাথিড্রালটির উচ্চতা ১২৫ ফুট, ৭৯ ফুট প্রশস্ত এবং ১১৭ ফুট দীর্ঘ। ১৩শ'—১৪শ' শতাব্দীর অঙ্কনশিল্পের একটি প্রাচীন কীর্তি ১১শ'' শতাব্দীর বাইজেন্টাইন-এর ভ্লাদিমিরের "পবিত্র কুমারী"র চিত্র, যা এখন ত্রেতিয়াকৃভ আর্ট গ্যালারীতে স্থানান্তরিত হয়েছে। "ক্যাথিড্রাল অব দি অ্যাজাম্পশনে"র পরে হচ্ছে "চার্চ অব দি ডিপোজিশন অব দি রোব্"-এর অবস্থিতি। ১৪৪৬ সালে এটি নির্মিত হয়। একই দিকে "ক্যাথিড্রাল অব দি এনান্‌সিয়েশন" অবস্থিত। এটি নির্মিত হয় ১৪৮৯ সালে। "ক্যাথিড্রাল অব দি এনান্‌সিয়েশন

এর সম্মুখে "আর্কঅ্যাঞ্জেল-ক্যাথিড্রাল"। এটি ১৫০৯ সালের কীর্তি। ১৭শ' শতাব্দীর রাশিয়ান পেইন্টিং-এর সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে, চমৎকার আইকনগুলি। এনান্‌সিয়েশন্‌ ক্যাথিড্রালের ঠিক পিছনেই ১৮৪৯ সালে নির্মিত হয় "গ্র্যাণ্ড ক্রেমলিন প্যালেস"। ৪১২ ফুট দীর্ঘ এই প্রাসাদটির সম্মুখ ভাগে মস্কোভা নদী প্রবাহিত। "গ্র্যাণ্ড ক্রেমলিন প্যালেস"এ সুপ্রিম সোভিয়েত অব দি ইউ. এস. এস. আর. (USSR) এবং আর. এস. এফ. এস. আর. (RSFSR) এর অধিবেশন বসে। মস্কো সফরের সময় এটি সম্রাট পরিবারের অস্থায়ী আবাস রূপে ব্যবহৃত হতো। এখানে অনেকগুলি প্রশস্ত "হল" আছে ; কিন্তু "হল অব সেণ্ট জর্জ" কতকগুলি কারণে বৈশিষ্ট্য পূর্ণ। এটি ২০০ ফুট দীর্ঘ, ৬৮ ফুট প্রশস্ত এবং উচ্চতায় ৫৮ ফুট। এই হলটি রাষ্ট্রীয় আপ্যায়ন এবং অফিসের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্যে ব্যবহৃত হয়। এখানে ১৯৪৫ সালে নাজি জার্মানীর বিরুদ্ধে জয়-সূচক অনুষ্ঠান পালিত হয়। এই স্থান থেকেই ১৯৬১ সালে প্রথম নভশ্চর য়্যুরী গ্যাগারিন তাঁর সম্মানসূচক উপহার—"গোল্ড স্টার অব হিরো অব সোভিয়েত ইউনিয়ন" গ্রহণ করেন। এখানে প্রতিবছর শীতকালীন ছুটিতে স্কুলের ছেলে-মেয়েরা তাদের নতুন বৎসরের উৎসব পালন করে। সেণ্ট জর্জ হলের পর হ'ল, "হল অব সেণ্ট ভ্লাদিমির"। "থ্রোন হল" হচ্ছে ১৭শ' শতাব্দীর আর একটি আকর্ষণীয় জিনিস, যা পূর্বে জারদের অফিস ছিল।

"গ্র্যাণ্ড ক্রেমলিন প্যালেস"-এর ৩,০০০ আসন বিশিষ্ট বৃহত্তম হলটিতে সুপ্রীম সোভিয়েতের অধিবেশন বসে। কন্‌স্টান্টিন্‌টন্‌ কর্তৃক ১৮৫১ সালে গ্র্যাণ্ড ক্রেমলিন প্যালেস-এর পরবর্তী স্থানে "আর্মারী" (অস্ত্রাগার) নির্মিত হয়। এর কিছুকাল পরে এটি মিউজিয়মে পরিণত হয়। এই মিউজিয়াম বা জাদুঘরে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বহু দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করা হয়েছে। এখানে তুর্কী, অস্ট্রিয়া,

পোল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, সুইডেন এবং গ্রেট ব্রিটেন প্রভৃতি রাষ্ট্রের দেওয়া বহু নামী এবং দামী জিনিস সংগৃহীত আছে। সর্বাপেক্ষা দামী সংগ্রহ হচ্ছে সুইডেনের রাষ্ট্রদূত কর্তৃক প্রদত্ত প্রায় ২০০ প্রকারের মহামূল্যবান দ্রব্যসম্ভার। তুলনামূলকভাবে—কার্ল-১২ কর্তৃক প্রদত্ত দুর্মূল্য অঙ্কনের কাজ ; যা স্টক্‌হল্‌মের কারুকার্যখচিত। ১৬৯৯ সালে এগুলিকে রাশিয়াতে আনা হয়।

ক্রেমলিন ছেড়ে আসার সময় আরও দুটি "টাওয়ার" চোখের দৃষ্টিকে কেড়ে নেয়। বামদিকে "ভডোভ্‌জ্‌ভোড্‌নী (Water-Raising) ঐ এলাকার মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর। উচ্চতা ২০০ ফুট। অপরটি "বরোভিৎস্কি টাওয়ার", যার উচ্চতা প্রায় ১৮০ ফুট। "বরোভিৎস্কি গেট থেকে প্রায় ১,০০০ ফুট দূরে "লেনিন লাইব্রেরী" অবস্থিত।

মস্কোর ঠিক মাঝখানেই, লেনিন যেখানে চিরনিদ্রায় শায়িত সেই সমাধিসৌধ আর ক্রেমলিন মহাপ্রসাদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে "লেনিন কেন্দ্রীয় মিউজিয়ম"—ভ্লাদিমির ইলিচের নামাঙ্কিত ভবনটি। মানব জাতির এই মহান নেতার উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চল থেকে সাড়ে-তিন কোটিরও বেশী লোক এই ভবনটিতে এসেছেন। প্রতি ঘণ্টায় এখানে "জীবন্ত লেনিন" নামে একটি দলিল চিত্র দেখানো হয়। অন্তরস্পর্শী এই ছবিটি দর্শকরা বারবার দেখতে ভালবাসেন। সিনেমাশিল্পের শৈশবাবস্থায় নির্মিত এই ফিল্‌মটির দৃশ্যপর্যায় পর্দার বুকে ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই প্রামাণিকতার এমন একটি বিশিষ্ট শক্তি অর্জন করে যেটা শুধু অত্যন্ত বিরল যথার্থ দলিলেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। ছবিটি দেখতে দেখতে লোকে লেনিনের আচার-আচরণের বিশিষ্ট ভঙ্গী, তাঁর হাসি, জ্বলজ্বলে চোখ দুটি কুঁচকে তাকানোর বিশেষ ধরন আর সাক্ষাৎকারীদের সমস্ত কথা গভীর মনোযোগের সঙ্গে শোনা,

ইত্যাদি মনে করে রাখার চেষ্টা করেন তাঁরা চেষ্টা করেন। নেতা ও অধিনায়ক লেনিনের অবিস্মরণীয় মূর্তিটিকে তাঁদের স্মৃতিপটে স্থায়ীভাবে এঁকে নিতে।

মিউজিয়মের ৩৪টি হল-ঘরের সবগুলিতে বড়ো আকারের ফোটোগ্রাফগুলিও একইভাবে দর্শকদের মনে রেখাপাত করে এবং তাদের মনকে ধ্যানমগ্ন করে তোলে। একটি ছবিতে দেখা যায়, ১৯১৯ সালের ১লা মে তারিখে লেনিন রেড স্কোয়ারে বক্তৃতা দিচ্ছেন। কিন্তু দর্শক এই ফোটোগ্রাফটিতে খুব পরিচিত একটা কিছুর অনুপস্থিতি লক্ষ্য না করে পারেন না। আরো ভালো করে লক্ষ্য করার পর দেখা যায়, ঐ ছবিটিতে লেনিন যেখানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন, সেই স্থানটি বর্তমানে দখল করে আছে বিশ্ব-বিখ্যাত লেনিন সমাধিসৌধ।

লেনিনের দেহ থেকে অস্ত্রোপচার করে বের করে আনা বুলেটটিকে প্রবীণ-নবীন সকলেই অনেকক্ষণ ধরে দেখেন। ১৯১৮ সালের অগস্ট মাসে এই মহানায়ককে হত্যা করার জন্যে প্রতিক্রিয়াশীলদের জঘন্য প্রয়াসের একটি বাস্তব নিদর্শন এই বুলেটটি। মাথার দিকে সামান্য একটু চেরা একটি ছোট মোটা বুলেট—এটা নেহাৎ দৈবক্রমেই ফাটেনি বটে, কিন্তু সেটা ভ্লাদিমির ইলিচের আয়ুষ্কালকে অনেকখানি হ্রাস করে দিতে পেরেছিল। "লেনিন তাঁর রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে চলেছেন। তিনি এই রোগকে জয় করবেনই!—এই হ'ল শ্রমিক শ্রেণীর কামনা, এই হ'ল তাঁর ইচ্ছার জোর, এইভাবেই সে ভাগ্যকে নির্ধারিত করে।" —১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে "প্রাভদা" প্রকাশিত হয়েছিল এই পৃষ্ঠা-জোড়া হেডলাইন নিয়ে। লেনিনের সঙ্গে সম্পর্কিত এই রকম প্রায় দশ হাজার পবিত্র স্মৃতি-নিদর্শন রাখা আছে এই মিউজিয়মে। কিন্তু, একথা বললে বোধহয় ভুল হবে না যে,

ভ্লাদিমির ইলিচের ব্যক্তিগত জিনিসগুলিই সবচেয়ে বেশী দর্শককে আকৃষ্ট করে: সাধারণ একটি মোটা কাঁচের জলখাবার গেলাস, সাদাসিধে একটি চা-চামচ, একটি দোয়াতদান। জারের গোয়েন্দা পুলিশের নজর থেকে আত্মগোপন করে থাকার সময়ে লেনিন ও তাঁর স্ত্রী নাদেজদা কনস্তান্তিনোভ্না ক্রুপ্স্কাইয়া এই জিনিসগুলি সঙ্গে নিয়ে ফিরেছেন।

শত শত মানুষ লেনিনকে দেখতে, তাঁর সাদাসিধে অনাড়ম্বর জীবন-যাপনের মাত্রাটি অনুধাবন করতে এসেছেন। এসেছেন বিশাল রুশ ভূমির সমস্ত অঞ্চলের কৃষক প্রতিনিধিরা, বিদেশী অতিথিরা—মঙ্গোলীয়, ব্রিটিশ, জার্মান, মার্কিন, ভারতীয় (এই শেষোক্তদের একটি প্রতিনিধিদল লেনিনকে যে চন্দন-কাঠের ছড়ি উপহার দিয়েছিলেন, সেটি এখানে দেখতে পাওয়া যাবে)। মিউজিয়মের কর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে এই যেসব স্মারক-নিদর্শন সংরক্ষণের ভার দেওয়া হয়েছে এই সব জিনিসের তাৎপর্য সম্বন্ধে তাঁরা ভালো ভাবেই সচেতন। তাঁরা এগুলি সযত্নে রক্ষা করার জন্যে সম্ভাব্য সব কিছুই করে থাকেন। দ্রষ্টব্য জিনিসগুলি পরপর দুটি স্বচ্ছ বায়ুরোধী কাঁচের ঢাকনীর নীচে সাজানো। বইয়ের প্রতি লেনিনের মনোভাব—তাঁর ব্যক্তিত্বের তাৎপর্যকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত করছে। আমরা জানি, তাঁর "সম্পূর্ণ রচনাবলী" ৫৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ।

ক্রেমলিনের যে ঘরগুলিতে লেনিন বাস করতেন—এই মিউজিয়মের একাংশে দর্শকরা দেখতে পাবেন তাঁর লেখা-পড়ার ঘরটির সমান আকার-আয়তনের একটি হুবহু অনুকৃতি। সেখানে লেনিনের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে রয়েছে ৮ হাজারেরও বেশী বই আর প্রায় ১,৪০০ সাময়িক পত্র। এই গ্রন্থাগারটি বইয়ের বিষয়বস্তু অনুসারে প্রায় ৯০ টি ভাগে বিভক্ত এবং ভ্লাদিমির ইলিচের আগ্রহের ক্ষেত্রটি যে কতোখানি ব্যাপক ছিলো, তা বোঝার পক্ষে

শুধু এই তথ্যটুকুই যথেষ্ট। জর্জ বার্নাড শ' লেনিনকে তাঁর 'ব্যাক টু মেথুসালা" বইটি উপহার দেবার সময়ে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গতভাবেই তার উপরে লিখে দিয়েছিলেন যে, "ইওরোপের সমস্ত রাষ্ট্রনেতার মধ্যে একমাত্র লেনিনেরই এরকম একটি দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হবার মতো প্রতিভা, চরিত্র ও জ্ঞান রয়েছে।"

এই কেন্দ্রীয় মিউজিয়মে "লেনিনিয়ানা" নামে একটি গ্রন্থ রাখা আছে। এটি হ'ল, বিশ্বের ১০৪ টি ভাষায় অনুদিত ও প্রকাশিত লেনিনের রচনাবলীর তালিকা, যার গ্রন্থনাম বা টাইটেলের সংখ্যা ১,২০,০০০। বলা বাহুল্য, বাংলা, হিন্দী, পাঞ্জাবী, উর্দু, তামিল প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত লেনিনের রচনাবলীও এই "লেনিনিয়ানা"র তালিকাভুক্ত। একটি হল-ঘরে বিশাল একটি ভূগোলকের গায়ে আঁকা লাল চিহ্নগুলি নির্দেশ করছে, লেনিনের বাণী যেসব স্থানে গিয়ে পৌঁছেছে, সেই জায়গাগুলি। এ হ'ল বিশ্ব জুড়ে লেনিনের জয়যাত্রার দিকচিহ্ন: পঞ্চাশটিরও বেশী দেশে বিশ্ব-শ্রমিক শ্রেণীর এই নেতার রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে।

এই লেনিন-ভবনে একটি অবিস্মরণীয় "শোক গৃহ" আছে, যেখানে ঢুকে দর্শকদের পদক্ষেপ আপনা থেকেই স্তব্ধ না হয়ে পারেনা। এই ঘরটির আবেগগত আবেদন বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েছে এখানকার গভীর নৈঃশব্দ্য, অবনমিত বৈপ্লবিক পতাকার চারিধারে কালো ক্রেপ কাপড়ের পাড়, আর—১৯২৪ সালের জানুআরি মাসের সেই বেদনাক্রান্ত ও নিদারুণ শীতার্ত দিনটিতে যেসব পুষ্পমাল্য অর্পিত হয়েছিলো, সেই মূল পুষ্পমাল্যগুলির দ্বারা। এগুলির মধ্যে একটিতে আটকানো ফিতের উপরে যে-কথাগুলি লেখা আছে তা সত্যিই মর্মস্পর্শী: "বিদায়, বন্ধু।—এম, গোর্কী।" ঘরের প্রান্তে শায়িত অবস্থায় রয়েছে মৃত্যুর পরে নেওয়া ছাঁচ থেকে তৈরী লেনিনের মুখ আর তাঁর হাত দুটি।

রক্তের মতো লাল রাষ্ট্রীয় পতাকার গায়ে লেখা আছে এই কথাগুলি: "পার্টির প্রতি। সমস্ত মেহনতী মানুষের প্রতি।" এখানেও আরেকবার শোনা যায় বিপ্লবের প্রথম আন্দোলনের সেই উদাত্ত ঘোষণা: "শ্রমিক শ্রেণীর মহান মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে, মার্কসের পরে আর কখনও আমাদের এই প্রয়াত নেতা, শিক্ষক ও বন্ধুর মতো এমন বিরাট এক ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটেনি। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে যা-কিছু মহৎ আর বীরোচিত—নির্ভয় বুদ্ধিমত্তা, লৌহ কঠিন অনমনীয় অটল সর্বজয়ী ইচ্ছাশক্তি, ক্রীতদাসত্ব আর নির্যাতনের বিরুদ্ধে ঘৃণা, পাহাড়কেও যা টলাতে পারে তেমনই বৈপ্লবিক নিষ্ঠা, জনগণের সৃজনশীল শক্তির উপরে অপরিসীম আস্থা, বিপুল সাংগঠনিক প্রতিভা—এই সবই এক অপরূপ রূপে মূর্তি গ্রহণ করেছিল লেনিনের মধ্যে—যাঁর নাম পশ্চিম থেকে পুব আর উত্তর থেকে দক্ষিণ জুড়ে এক নূতন বিশ্বের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

মস্কোর একেবারে মাঝখানে এই লেনিন ভবনের দিকে এগিয়ে চলে দর্শকদের অন্তহীন স্রোত—বিশ্বের সমস্ত দেশের মানুষ, প্রতিদিন প্রায় ১৪,০০০ থেকে ১৫,০০০ দর্শক। "দর্শকদের খাতায়" অসংখ্য মন্তব্য লিপিবদ্ধ আছে। সেগুলির মধ্যে এই একটি মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে যে অধিকাংশ দর্শকেরই অনুভূতি ব্যক্ত হয়েছে, সেকথা বললে ভুল বলা হবে না:

"এই বাড়িটি থেকে বেরিয়ে আসার সময়ে প্রত্যেকেই লেনিনের মহত্ত্ব অনুভব করে। বিশ্ব ইতিহাসের স্রোতের মুখ যাঁরা ঘুরিয়ে দিয়েছেন লেনিন সেই মহামানবদের অন্যতম। তিনি ছিলেন সারা দুনিয়ার শোষিত জনগণের নেতা এবং সেই জন্যেই এই ভবনটি কোটি কোটি মানুষের তীর্থস্থান।—ভারতের লোকসভার সদস্যবৃন্দ।"

আমরা যখন রাশিয়ায় অর্থাৎ ১৯৭৩-এর নভেম্বরে তখন

মস্কোর
রেড স্কোয়ারে
অক্টোবর
বিপ্লব দিবস
উপলক্ষে মিছিল
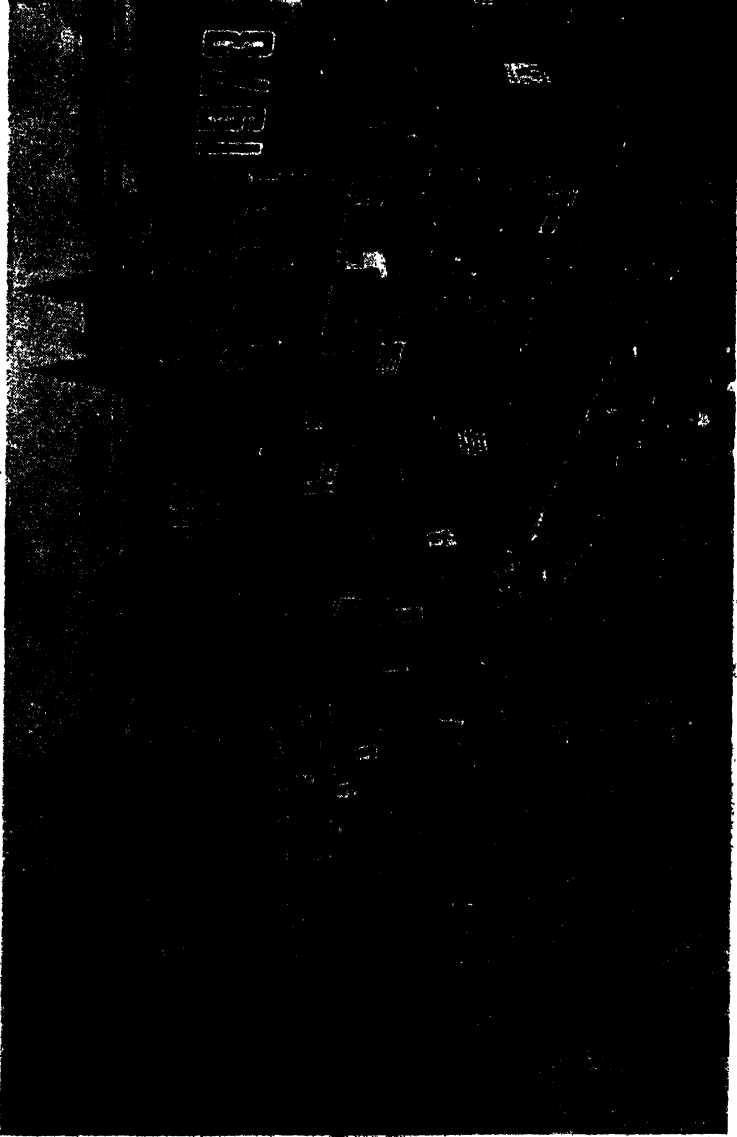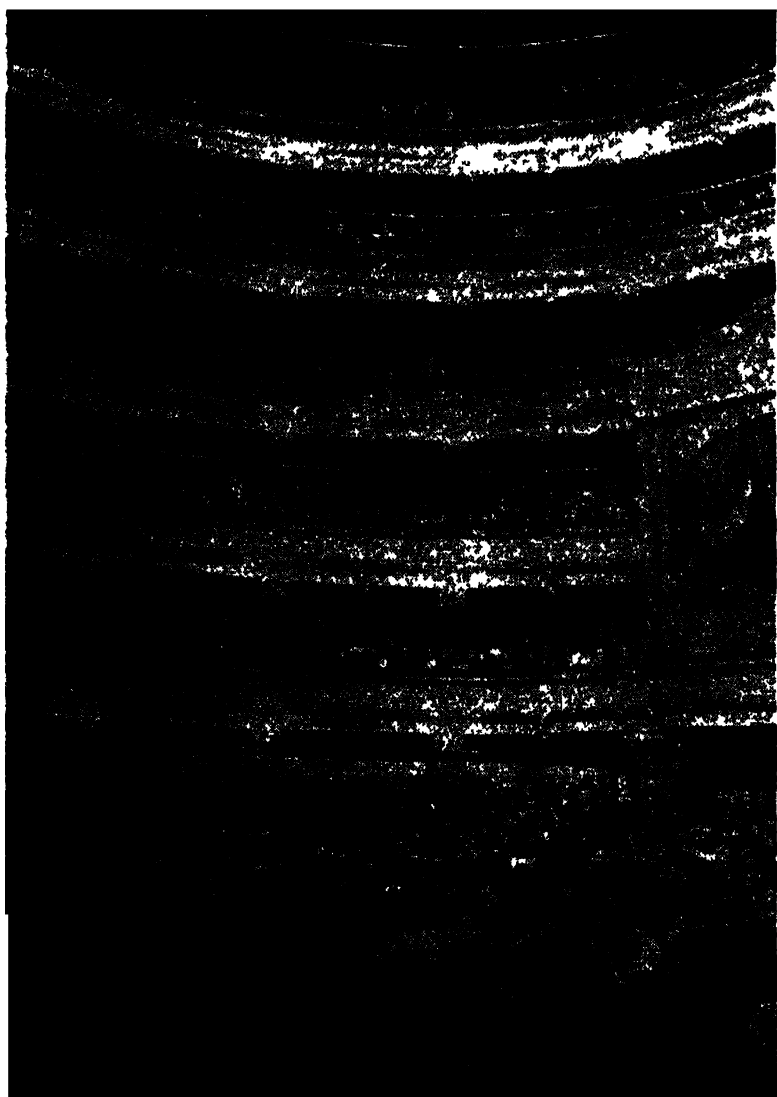
মস্কোর বলশোই থিয়েটারের অভ্যন্তরে

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক লিওনিদ ব্রেজনেভ-এর ভারত সফরের কর্মসূচী চূড়ান্ত হয়ে গেছে; অর্থাৎ নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে ব্রেজনেভ ভারত সফরে আসবেন; আমরা দ্বিতীয় সপ্তাহে রুশ সফরে আছি। তাই সততঃই ব্রেজনেভ-এর ভারত সফর নিয়ে সর্বত্রই কিছু না কিছু কথাবার্তা হতো। রাশিয়ার পত্র-পত্রিকায় প্রতিদিন ভারত-রুশ সম্পর্কের ওপর নানা নিবন্ধ প্রকাশিত হতো। কিন্তু এই সময় আরো দুটি ঘটনা বিশেষ তাৎপর্য সৃষ্টি করেছিলো। একটি ঘটনা হলো সোভিয়েত ইউনিয়ন এশিয়ার যৌথ নিরাপত্তার জন্যে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, সেই প্রস্তাব নিয়ে নানা মহলে নানা আলোচনা হচ্ছে। অপর ঘটনা হলো এই যে, এই সময়ই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আফ্রো-এশীয় সম্মেলনে "সুপার পাওয়ার" সম্পর্কে কিছু কথা বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীমতী গান্ধীর সুপার পাওয়ার সম্পর্কে বক্তব্যে আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রায় একই চোখে দেখা হয়েছে এমনও ব্যাখ্যা কেউ কেউ করছিলেন। তাই আমরা যখন রাশিয়াতে বিভিন্ন ভারতবিদ, রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মিলিত হয়েছি, তখন এই এশিয়ার যৌথ নিরাপত্তার প্রশ্ন, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সুপার পাওয়ার সম্পর্কে মন্তব্য এবং ব্রেজনেভ-এর আসন্ন ভারত সফর সম্পর্কে প্রশ্নগুলির বিষয় আলোচনায় প্রাধান্য পেতো। আমরা রাশিয়ার রাজধানী মস্কো থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রদেশের রাজধানীতে ভ্রমণকালে বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদদের সঙ্গে আলোচনাকালে লক্ষ্য করেছি, সকলেরই চিন্তা-ভাবনা, মনোভাব যেন এক সূত্রে বাঁধা। এশিয়ার যৌথ নিরাপত্তা সম্পর্কে অথবা ভারত-সোভিয়েত বন্ধুত্বের তাৎপর্য সম্পর্কে একজন ভারতবিদ যে কথা চিন্তা করেন, একজন সাধারণ রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ন

রাশিয়ান নাগরিকের চিন্তাও এক। তবে প্রকাশভঙ্গীর কিছুটা হেরফের থাকতে পারে।

১২ই নভেম্বর আমরা নভোস্তি প্রেস এজেন্সীর এশিয়া বিভাগের প্রধান সম্পাদক আলেক্সি পুশকভ এবং ইণ্ডিয়াডেস্কের প্রধান মিঃ আশিভকোভ-এর সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলাম। দীর্ঘ আলোচনা এবং মত ও চিন্তার বিনিময় হ'ল। আলোচনা প্রসঙ্গে মিঃ পুশকভ বললেন, একমাত্র শান্তিপূর্ণভাবেই সারা পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব বলে তাঁর ধারণা। অন্যথায় সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। মিঃ পুশকভ আরও জানালেন, সহ-অবস্থানের প্রতি আস্থার ওপরই ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী ও সহযোগিতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী দৃঢ়তর হচ্ছে, কারণ, সোভিয়েত ইউনিয়নের ধারণা, শ্রীমতী গান্ধী অপুঁজিবাদী পথে ভারতের অগ্রগতির জন্যে চেষ্টা করছেন, যার অবধারিত পরিণতি সমাজতন্ত্র; যে-সমাজতন্ত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে গ্রাহ্য। তাই শ্রীমতী গান্ধীকে তাঁর স্বনির্বাচিত পথে চলতে দেওয়া এবং সাহায্য করা হ'ল সোভিয়েত নীতি। কথা প্রসঙ্গে আমরা ধীরে ধীরে তুললাম, শ্রামতী ইন্দিরা গান্ধী সম্প্রতি সুপার পাওয়ার সম্পর্কে যা বলেছেন, তার প্রতিক্রিয়া জানতে। রুশ রাজনীতি বিশেষজ্ঞ হিসাবে নভোস্তি প্রেসের প্রধান ও তাঁর সহকারী বললেন, তাঁরা এই রকম কোনও কথা শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন বলেই জানেন না। সুপার পাওয়ার হিসাবে রুশ ও মার্কিন বিশ্বভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে, এমন কথা বলে আসছে চীনাপন্থীরা। রুশ নেতৃবৃন্দ দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, তাঁরা কখনই মনে করেন না যে, শ্রীমতী গান্ধী কোনও অবস্থায়

মার্কিন ও সোভিয়েতকে এক আসনে দেখবেন বা বসাবেন। চীন ও দক্ষিণপন্থী ও সংকীর্ণতাবাদী শক্তি আছে, যারা মনে করে রুশ-মার্কিন একটা যুদ্ধ হলে তাদের সুবিধা হবে। ভারতেও কিছু দক্ষিণপন্থী ও সংকীর্ণতাবাদী থাকতে পারে, যারা মনে করে রুশ-মার্কিন যুদ্ধ হলে ভারতে তাদের সুবিধা হবে। কিন্তু আসল কথা হ'ল, সোভিয়েতের সঙ্গে মার্কিনের আদর্শগত যুদ্ধ চলছে এবং এই যুদ্ধ চলবে। আমরা চাই ভারত সমাজতন্ত্রের শিবিরে থাক এবং থাকবে এটা আশা করার যথেষ্ট বাস্তবসম্মত কারণ আছে। কিন্তু মার্কিনরাও নিশ্চেষ্ট নয়; তারাও চাইবে ভারতকে তাদের সঙ্গে রাখতে। আলোচনা প্রসঙ্গে মিঃ পুশকভ আরো বললেন, তিনি কখনও শোনেন নি যে, শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন, দুই সুপার পাওয়ার যেন তুলনায় দুর্বল এবং অনগ্রসর দেশগুলির মতামতকে উপেক্ষা ক'রে তাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে প্রবৃত্ত না হয়। দেশে ও বিদেশে শ্রীমতী গান্ধী এই মন্তব্য একাধিকবার করেছেন। এই সেদিনও নিরাপত্তা পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীসমর সেন পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে সোভিয়েত-মার্কিন যুক্ত প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় শ্রীমতী গান্ধীর উক্তির প্রতিধ্বনি করেছেন। তবে তিনি শুধু এইটুকু জানেন যে, চীনা নেতারা বলছেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আমেরিকা পৃথিবীটাকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিতে উদ্যত। ভারতের দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি চীনের এই ভিত্তিহীন অভিযোগের প্রতিধ্বনি করছেন বলে তিনি জানেন; কিন্তু শ্রীমতী গান্ধীর তথাকথিত মন্তব্য সম্পর্কে তিনি কিছুই শোনেন নি। স্পষ্ট বোঝা গেল, শ্রীমতী গান্ধীর উক্তিকে কেন্দ্র করে কোনও বিতর্ক তুলতে সোভিয়েত ইউনিয়ন রাজী নয়। ভারতের সঙ্গে মৈত্রী-নীতির স্বার্থে সোভিয়েত ইউনিয়ন এই ধরনের মন্তব্যকে উপেক্ষা করা স্থির করেছে। আলোচনা হলো "এশিয়া যৌথ নিরাপত্তা"

নিয়ে। সকলেই আমাদের বোঝাতে চেয়েছেন এর তাৎপর্য ও গভীরতা। সোভিয়েত ইউনিয়নের মনোভাব সম্পর্কে আমরা যা শুনেছি ও বুঝেছি, তা হলো, রাশিয়া আন্তরিক ভাবেই এশিয়ায় যৌথ নিরাপত্তা চুক্তি বা ব্যবস্থা চায়। তারা মনে করে, এশিয়ায় যৌথ নিরাপত্তার চিন্তাধারা এশিয়ার সবগুলি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এশিয়ায় নয়া উপনিবেশবাদী শাসন চাপিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদীরা নানা আগ্রাসী গোষ্ঠী খাড়া করেছিলো, সামরিক-রাজনৈতিক জোট স্থাপন করেছিলো এবং দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলো। সাম্রাজ্যবাদী ব্ল্যাকমেইল সত্ত্বেও এশিয়ার অধিকাংশ দেশ সামরিক জোটগুলির সঙ্গে নিজেদের ভাগ্যকে জড়িত করতে অস্বীকৃত হয়েছিলো। এশিয়ার বিভিন্ন দেশ তাদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শান্তি-নীতির প্রধান কর্মধারা হিসাবে জোট-নিরপেক্ষতার নীতিকে বেছে নিয়েছিলো। সমাজ-তান্ত্রিক দেশগুলি কর্তৃক অনুসৃত সুসঙ্গত শান্তিকামী 'নীতির পাশাপাশি জোট-নিরপেক্ষতার নীতি এশিয়ায় রাজনৈতিক বাতা-বরণের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। এরূপ অবস্থার প্রেক্ষিতে এশিয়ায় যৌথ-নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা বেশ সময়োচিত বলে মনে হয়। সোভিয়েত প্রস্তাবটি রূপায়িত হলে তা মহাদেশে এমন একটি পরিস্থিতির বিকাশে সাহায্য করবে যে পরিস্থিতি সাম্রাজ্য-বাদীদের পক্ষে আগ্রাসী যুদ্ধ শুরু করা এবং এশিয়ার দেশগুলির ও জাতিগুলির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ অসম্ভব করে তুলবে। যৌথ নিরাপত্তা এশিয়ার একটি দেশকে অপর দেশের বিরুদ্ধে লাগানো থেকে, এই সব দেশ উপনিবেশবাদের কাছ থেকে যেসব বিরোধের উত্তরাধিকারী হয়েছিলো সেগুলিকে কাজে লাগানো থেকে সাম্রাজ্যবাদকে নিবৃত্ত করবে।

এশিয়ায় যৌথ নিরাপত্তার চিন্তাধারার নিহিতার্থ হ'ল এই

ব্যবস্থার অন্তঃপাতী সদস্যদের মধ্যে স্বাভাবিক রাজনৈতিক সম্পর্ক এবং ব্যাপক অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও অন্যবিধ সহযোগিতা বিদ্যমান থাকবে। পারস্পরিক সাহায্য ও সমর্থনের কল্যাণে, এশিয়ার স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির মিলিত চেষ্টার কল্যাণে এই মহাদেশ বিদেশী একচেটিয়াপতিদের শাসন থেকে অর্থব্যবস্থাকে মুক্ত করার সংগ্রামে অতিরিক্ত সম্পদ ও সম্ভাবনার অধিকারী হবে। এশিয়াকে শান্তি ও সহযোগিতার মহাদেশে রূপান্তরিত করতে হলে সবগুলি দেশের, বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তি ও আন্দোলনের বিপুল প্রয়াস দরকার হবে। বিভিন্ন স্তরে পরামর্শ করার জন্যে অনেক কাজ করতে হবে। এই পরামর্শ চলার সময় নিখিল এশিয়া ভিত্তিতে সহযোগিতার নানাদিক আলোচনার জন্যে উপস্থাপিত হবে। এশিয়ার পক্ষে একান্ত সময়োপযোগী যৌথ নিরাপত্তার চিন্তাধারার বিকাশ ও রূপায়ণে এশিয়ার প্রতিটি দেশের সদর্থক অবদান রাখার বাস্তব সম্ভাবনা রয়েছে।

১৯৬৯ সালে ব্রেজনেভ এশীয় যৌথ নিরাপত্তার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্বিংশতি কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্টে, সোভিয়েত ইউনিয়নের ট্রেড ইউনিয়ন-গুলির পঞ্চদশ কংগ্রেসে এবং সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সমূহের পঞ্চদশ বার্ষিকী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত রিপোর্টে ব্রেজনেভ এই প্রস্তাব আরও বিশ্লেষণ করেন। ১৯৭৩ এর ১৫ই অগস্ট আলমা-আতায় এক বক্তৃতা প্রদান কালে তিনি বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সোভিয়েত গভর্নমেণ্ট এশিয়ায় যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্যে সক্রিয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কারণ তাঁরা এশিয়া মহাদেশকে যুদ্ধ, সশস্ত্র সংঘর্ষ এবং সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ থেকে মুক্ত করতে চান। ব্রেজনেভ

বলেন, "আমরা চাই প্রত্যেকটি দেশ এবং জাতি স্বাধীন বিকাশ এবং জাতীয় পুনরুজ্জীবনের গ্যারান্টি লাভ করুক এবং এশিয়ার দেশগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কে আস্থা এবং বোঝাপড়ার আবহাওয়া বিরাজ করুক।" তিনি আরও বলেন যে এশিয়ার সকল দেশ যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থার সমান অংশীদার হোক এটাই সোভিয়েত ইউনিয়নের কাম্য। ব্রেজনেভ জানান, আমরা যে ব্যবস্থার কথা বলছি, তাতে কেউই এককভাবে কোনও বিশেষ সুবিধা পাবে না। এশিয়ার প্রত্যেকটি রাষ্ট্রকেই এই ব্যবস্থা গড়ে তোলার কাজে সাহায্য করতে হবে। তৈরী না করা জমির ওপর কোনও নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব আমরা করতে চাইনা। যে সকল নীতির ওপর প্রস্তাবিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে তার অনেকগুলিই হচ্ছে বান্দুং সম্মেলনের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। বাকীগুলো এশিয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলেই স্থান লাভ করেছে।"

১২ই নভেম্বর নভোস্তি প্রেস থেকে বের হয়ে একখানা গাড়ি নিয়ে আমরা তিনজন রওনা হলাম শ্রী ননী ভৌমিকের দপ্তর "প্রগতি প্রকাশনী" ভবনের দিকে। গাড়িতে আমি আর শঙ্করবাবু পিছনের আসনে, আর ড্রাইভারের পাশে বসে আনাতোলে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ি। অবিরাম বরফ-বৃষ্টি চলছে। আকাশ দেখে বুঝবার উপায় নেই এটা সকাল, দুপুর না সন্ধ্যা। মিনিট পাঁচেক চলবার পর একসময় লক্ষ্য করলাম, আনাতোলে গাড়ির একটা কাঁচ খুলে দিলো। ছুঁচের মতো বরফ মিশ্রিত ঠাণ্ডা হাওয়া নাকে এবং চোখে লাগছে। শরীরের মধ্যে নাক আর চোখটাই শুধু খোলা। এরপর দেখলাম আনাতোলে তার মাথাটা কেমন অস্বাভাবিকভাবে নাড়ছে। তখনও বুঝতে পারিনি, কি ঘটছে।

মিনিট খানেকের মধ্যে দেখলাম আনাতোলে কেবল গাড়ির মধ্যে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। তারপর কাৎ হয়ে পড়ে গেলো ড্রাইভারের পাশে। ড্রাইভার গাড়িটা দ্রুত রাস্তার একপাশে দাঁড় করালো। আমরা আনাতোলের শরীরের ওপর ঝুঁকে পড়লাম। দেখি আনাতোলের মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে, আনাতোলে অজ্ঞান হয়ে গেছে। কিছুই বুঝতে পারছিনা আমরা কি করবো। ড্রাইভার আমাদের ভাষা বুঝবেনা; তাকে কিছু বলে লাভ নেই। আনাতোলের পরিচয় অথবা আমরা কোথায় যাবো সেসব কথা বলেও কিছু লাভ নেই। কি করবো ভাবছি, কিন্তু দেখলাম, আমাদের কিছুই করতে হলো না। ড্রাইভার সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়িয়ে কি একটা শব্দ উচ্চারণ করলো, দেখলাম রাস্তার বিপরীত পাশ থেকে দুজন পুলিস ছুটে আসছে। পুলিস দুজন এসে ড্রাইভারের সাথে দু-একটি কথা বলে আনাতোলেকে একনজরে দেখে রাস্তার পাশে একটা বাড়ির দেওয়ালের কাছে গেলো। দেখলাম, দেওয়ালের একটা ফোকরের মধ্যে রয়েছে টেলিফোন। টেলিফোনটা তুলে কাকে কি বললো জানি না, কথা শেষ করে আবার চলে এলো গাড়ির কাছে। আবার ড্রাইভারের সঙ্গে কি একটু কথা হলো তার কিছুই আমাদের বোধগম্য নয়। কিন্তু দেখলাম, আমাদের তিনজনকে নিয়েই গাড়ি আবার চলতে শুরু করলো। কয়েক মিনিটের মধ্যে দেখলাম আমরা ঠিক যে জায়গা থেকে রওনা হয়েছিলাম, ঠিক সেই জায়গাটায় গাড়িটিকে এনে দাঁড় করালো। গাড়িটি দাঁড় করিয়েই একটু এদিকে-ওদিকে দেখলো তারপর আমরা নভোস্তি প্রেসের যে সিঁড়ি দিয়ে নেমেছিলাম, সেই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলো। আমরা দম বন্ধ করে গাড়ির মধ্যে বসে আছি। মিনিট খানেকের মধ্যে দেখি দু-তিনজন লোককে নিয়ে ড্রাইভার চলে এসেছে। ড্রাইভারের সঙ্গের

লোকগুলি আনাতোলেকে দেখেই নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করলো, তারপর তাদের মধ্যে একজন দ্রুত আবার ফিরে গেলো। এরপর দেখলাম, মিঃ পুশকভকে সঙ্গে নিয়ে সেই লোকটি নেমে আসছে। মিঃ পুশকভ এসেই বললেন, আপনারা গাড়ি থেকে নেমে আসুন, আনাতোলেকে নিয়ে এই গাড়ি হাসপাতালে যাচ্ছে। মিঃ পুশকভের কথা শেষ হবার আগেই দেখি একখানা এ্যাম্বুলেন্স এসে দাঁড়ালো এবং মুহূর্তের মধ্যে আনাতোলেকে তুলে নিয়ে চলে গেলো। মিঃ পুশকভ দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, "আপনাদের একটু কষ্ট হলো, আনাতোলে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আপনারা এই গাড়িতে হোটেলে ফিরে যান। আমরা যত তাড়াতাড়ি পারি দ্বিতীয় দো-ভাষী পাঠিয়ে দিচ্ছি।" আমরা গাড়ি করে হোটেল-মুখো রওনা হলাম। আমি এবং শঙ্করবাবু এতক্ষণ নিজেদের মধ্যেও কোন কথাবার্তা বলিনি। সমগ্র ঘটনাটা আমার বলতে যে সময় লাগলো, ঘটতে কিন্তু এতো সময় লাগেনি। অবাক হয়ে ভাবছিলাম, ড্রাইভারটির উপস্থিত বুদ্ধি ও দায়িত্ববোধের কথা। ড্রাইভার যখনই বুঝেছে আমরা ভিন্‌দেশী, আমাদের ভাষা সে বুঝবে না, তখন সে নিজের বুদ্ধিতে আমাদের ঠিক যেখান থেকে তুলেছিলো, সেখানে নিয়ে এলো এবং ঠিক নভোস্তি প্রেসের লোকদের খুঁজে বের করে তাদের হাতেই অসুস্থ ব্যক্তির দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলো।

হোটেলে বসে অতঃপর ভাবছি, এইদিন রাত্রেই আমাদের লেনিনগ্রাদ রওনা হবার কথা। সন্ধ্যেবেলা বিখ্যাত রুশীয় সার্কাস দেখবার টিকিট কাটা আছে। চায়ের কাপ শেষ হবার আগেই টেলিফোন বেজে উঠলো। টেলিফোন তুলে "হ্যালো" বলতেই বিপরীত দিক থেকে সুন্দর বাংলায় একজন বললেন, "নমস্কার"। প্রথমে হকচকিয়ে গেলাম। গলা শুনে বুঝছি, রুশীয়, কিন্তু ভাষা শুনে বুঝবার উপায় নেই তিনি বাঙালী কি না। বিপরীত দিক

থেকে যিনি কথা বলছিলেন, তিনি বললেন, "আমার 'পরে দায়িত্ব পড়েছে আপনাদের সঙ্গ দেবার। আমি এক্ষুণি আপনাদের কাছে পৌঁছুচ্ছি।" আমি সবকথা ছেড়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি এতো সুন্দর বাংলা জানলেন কোত্থেকে?" বিপরীত দিক থেকে ভেসে এলো প্রাণখোলা হাসির শব্দ। তিনি বললেন, "খুঁজে বের করতে পারলে আমার মতো বাংলা-জানা লোক মস্কো শহরে ডজন ডজন পাবেন।" আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের নতুন দো-ভাষী এলেন। পরিষ্কার বাংলায় কথা বলেন। বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে খুবই জ্ঞান। কলকাতায়ও গেছেন, থেকেছেন অনেকদিন। তাই বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশ দুই সম্পর্কেই তাঁর পরিষ্কার জ্ঞান ও ধারণা। নতুন দো-ভাষী বাংলা জানায় আমাদের সুবিধা হলো বটে, কিন্তু অসুবিধাও কিছু কম হলো না। কারণ এ কয়দিন আমি ও শঙ্করবাবু মাতৃভাষায় যেভাবে কিঞ্চিৎ পরচর্চা-পরনিন্দা করতাম, অথবা ভালো হতো আরও ভালো হলে" বিষয় নিয়ে গবেষণা ও আলোচনা করতাম, সেটা বন্ধ হলো।

১২ তারিখ রাত্রি বারোটায় ট্রেনে চেপে রওনা হলাম লেনিনগ্রাদ। মস্কোর লেনিনগ্রাদ স্টেশন থেকে যে গাড়িতে আমরা উঠলাম, সে গাড়িটির নাম "রেড অ্যারো"। মস্কো থেকে লেনিনগ্রাদের দূরত্ব হাজার কিলোমিটারের কাছাকাছি। গাড়িতে গিয়ে নির্দিষ্ট কামরায় প্রবেশ করলাম; দেখি বিছানাপত্রের যা ব্যবস্থা এবং কামরাটি যেভাবে সাজানো, তাতে নিজেদের বর্বর মনে হচ্ছিলো। কামরার মধ্যে রেডিও, টেলিভিশন থেকে শুরু করে চা-কফি এবং জলযোগের সব ব্যবস্থাই আছে। বেল টিপুন, একজন সুন্দরী মহিলা আসবেন এবং আপনার প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পানীয় গুছিয়ে

দেবেন। সকাল হবার আগেই পৌঁছুলাম লেনিনগ্রাদ। "রেড অ্যারো" ট্রেনখানি মস্কো ছেড়ে এসে থেমেছে লেনিনগ্রাদে। মাঝে কোনও স্টপ নেই। সব ব্যবস্থা দেখার পর লজ্জার মাথা খেয়ে দো-ভাষীকে জিজ্ঞাসা করলাম, ট্রেনের ভাড়াটা কতো? দো-ভাষী যা হিসাব দিলেন, তাতে বোঝা গেলো, দশটাকার মতো। আমরা গিয়ে উঠলাম "হোটেল লেনিনগ্রাদে"। নেভা নদীর ওপরে সুবৃহৎ হোটেল লেনিনগ্রাদে ১৭ তলায় আমাদের জন্যে দুখানা ঘর। ঘরের জানলা খুললে সামনে নেভা নদী। নদীর ওপারে পিটার পল্‌স্‌-এর প্রাসাদ। আর একদিকে রয়েছে সেই বিখ্যাত ক্রুজার যেখান থেকে প্রথম কামান দাগবার পর পেত্রোগ্রাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো লেনিনের নেতৃত্বে বিপ্লবী বাহিনী। হোটেলের অদূরে রয়েছে ফিনল্যাণ্ড স্টেশন। যেখানে গাড়ি থেকে নেমে লেনিন সাঁজোয়া গাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে হুকুম দিয়েছিলেন, "চলো, এগিয়ে চলো; দখল করো পেত্রোগ্রাদ।"

হোটেলের জানলা দিয়ে যতবার তাকাচ্ছি চোখের সামনে অরোরা জাহাজখানিকে দেখতে পাচ্ছি। রোমানদের পুরানো কাহিনীতে অরোরা হলেন ঊষাদেবী। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে এই জাহাজখানি সমুদ্রে ভাসানো হয়েছিল, ১৭ বছর পরে এই জাহাজেরই কামান গর্জন জানিয়েছিলো বিপ্লবের সংকেত—যে বিপ্লব এক নবযুগের ঊষার অভ্যুদয় ঘটিয়েছিলো। পিটার পল্‌স্‌-এর প্রাসাদ দেখতে গেলাম। ইতিহাসকে অবিকৃত ও অবিনশ্বর রাখার কতো সাফল্য অর্জন করা সম্ভব তা এই পিটার পল্‌স্‌-এর প্রাসাদ ও মিউজিয়াম না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। বিস্ময় ছড়িয়ে রয়েছে প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি তলায়। হাজার হাজার বছরের পুরাতন মমি থেকে আধুনিক চিত্রকরদের চিত্রকলা এখানে রয়েছে। পুরাতন রাজা বা জারদের সমস্ত ব্যবহৃত দ্রব্যসম্ভার, পোশাক-পরিচ্ছদ, এমনকি, কয়েকটি

মৃত অশ্বকেও অবিকৃতভাবে রাখা হয়েছে। রয়েছে পুরাতনকালের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র, রয়েছে বীর যোদ্ধাদের ছবি—আলাদা একটা গ্যালারি রয়েছে তাদের জন্যে, যারা নোপোলিয়নকে পরাজিত করেছিল। প্রসাদের অদূরে রয়েছে বিজয়স্তম্ভ। নেপোলিয়নের পরাজয় ও রুশদের বিজয়ের এমন বহু মূর্তি রয়েছে, যে মূর্তির দিকে একবার তাকালেই আপনার চোখ নীচু হয়ে যাবে। এই সংগ্রহশালা শুধু পুরাতত্ত্বের বা আধুনিক চিত্র ও ভাস্কর্যের সংগ্রহশালা, এমন নয়, এটিকে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও বলা চলে। হাজার হাজার ইউনিফর্ম পরা ছেলে-মেয়ে এখানে এসেছে—তাদের নিয়ে ঘরে ঘরে ক্লাস হচ্ছে। শিক্ষয়িত্রীরা ইতিহাসের অধ্যায়ের সঙ্গে ঐতিহাসিক বস্তুর পরিচয় করিয়ে ইতিহাস পাঠ করাচ্ছেন। চিত্রকলা ও চিত্রশিল্পের ছাত্রবা ছবি আঁকার তালিম নিচ্ছে, চিত্র গ্যালারীর ঘরে ঘরে। এমনকি হবু ডাক্তারেরাও এখানে এসে পুরাতন জীবজন্তু, মানব দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে জ্ঞান নিচ্ছেন। সবচেয়ে ভালো লাগলো এই ক্লাসগুলি যখন চলছে তখন তারই পাশ দিয়ে হাজার হাজার দর্শক, টুরিস্ট তাঁরাও প্রদর্শনী দেখছেন, গাইডরা তাদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন, কিন্তু কোন পক্ষেরই কোনও ব্যাঘাত হচ্ছে না। কোনও পর্যায়েই দেখলাম না একজন ছাত্র বা ছাত্রী পিছন ফিরে তাকালো, আমাদের দেখলো বা কোন প্রকার কৌতূহল প্রকাশ করলো। চলমান দর্শকের মিছিল চলেছে তাঁদের মতো ; ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস করছে তাদের মতো। এ এক বিচিত্র সহ-অবস্থান।

এই লেনিনগ্রাদ শহরেই পিটার দি গ্রেট স্মারক-"ব্রোঞ্জ সওয়ার" অবস্থিত। দোমেনিকো ত্রেৎসিনি এই দুর্গের ভিতরে যে গীর্জাটি নির্মাণ করেন, তার ভিতরে অপূর্ব সোনালী কারুকার্যমণ্ডিত কাঠের কুলুঙ্গিগুলি সুন্দর ভাবে সাজানো রয়েছে নানা রকম সাধুসন্তদের চিত্র ও মূর্তি দিয়ে। বিখ্যাত কাঠ-খোদাই

শিল্পীদের চেষ্টায় ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে এগুলি গড়ে ওঠে। এই দুর্গ প্রাকারের অপূর্ব অলঙ্করণে মণ্ডিত 'নেভ্স্কি সিংহদরজা'টি ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তৈরি করেছিলেন স্থপতি এন. এ. লভোভ্। বিখ্যাত ভাস্কর কে. বি. রাস্ত্রেলি হলেন মহাসম্রাট পিটারের অশ্বারূঢ় মূর্তির রচয়িতা। মহাসম্রাট পিটার তাঁর নিজের কালে সেণ্ট পিটার্সবুর্গের বাগান-বাগিচাগুলি গড়ে তুলতে গিয়ে সেগুলিকে "ফরাসী রাজার ভার্সাইয়ের বাগ-বাগিচাগুলির চেয়েও সুন্দরতর" করে সাজাবার স্বপ্ন দেখেছিলেন। দেশপ্রেমিক যুদ্ধের সময় সমস্ত ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নগুলি নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা হলেও পিটার দি গ্রেট-এর অশ্বারূঢ় মূর্তিটির কোন স্থানান্তর ঘটানো হয়নি। এটিকে রেখে দেওয়া হয়েছিলো রাশিয়ার শক্তির প্রতীক হিসেবে, যা জনসাধারণকে সংগ্রাম ও সাফল্য অর্জন করতে অনুপ্রাণিত করেছিলো। পিটার ও পল দুর্গটি রাশিয়াকে একটি বিরাট নৌ-শক্তিতে পরিণত করার জন্যে পিটারের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। সুপ্রশস্ত এই দুর্গপ্রাকারের ভিতর রয়েছে কতকগুলি কয়েদ-ঘর আর ছোট ছোট কুঠরী, যেখানে পরবর্তীকালে বিচারাধীন বন্দীদের আটকে রাখা হতো।

লেনিনগ্রাদ মস্কোর থেকে একেবারে আলাদা। মস্কো এই দেশের প্রতিনিধিস্থানীয় শহর। দেশের রাজধানী। এটা সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষুদ্র সংস্করণ; কিন্তু লেনিনগ্রাদের নিজস্ব সত্তা রয়েছে। পিটার দি গ্রেট-এর আগে মস্কো ছিলো এদেশের রাজধানী। শহরটি আবার রাজধানীতে পরিণত হয় অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে। রুশ সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ সমারোহ ও গৌরবের সাক্ষী এই লেনিনগ্রাদ—যার আগের নাম ছিলো পিটার্সবুর্গ। লেনিনগ্রাদ শহরটা ঘুরে দেখবার সময় আমরা বিভিন্ন স্থাপত্য সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করছিলাম। পিটার ও পল দুর্গের ভিতরে

এই একই নামের গীর্জাটি, গীর্জার ভিতরে সুন্দর সোনালী কারু-কার্যমণ্ডিত কাঠের কুলুঙ্গীগুলি সাজানো রয়েছে ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে তৈরী সাধুসন্তদের মূর্তি আর চিত্র দিয়ে। এতে রয়েছে ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত দুর্গপ্রাকারের অপূর্ব অলঙ্করণে মণ্ডিত "নেভ্স্কি সিংহদরজা"টি এবং ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে "কিরভ্স্কি বীথিপথ" এর প্রান্তসীমায় অবস্থিত মানোয়ারী জাহাজ "স্তেরেগুশ্চি"র নাবিকদের উদ্দেশ্যে একটি স্মারক-স্তম্ভ; ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে জাপানী নৌবাহিনীর কয়েকটি জাহাজের বিরুদ্ধে এক অসমযুদ্ধে বীরের মতো প্রাণ দান করেছিলেন যাঁরা তাদের উদ্দেশে সেই স্মারকস্তম্ভটি। খ্রীষ্টীয় সন্ন্যাসিনীদের জন্যে অলঙ্কারবহুল নীল আর সাদা রঙের ইমারতটির স্থপতি রাস্ত্রেলি ছিলেন লেনিনগ্রাদের অধিকাংশ সুন্দর স্থানগুলির পরিকল্পনাকারী ও নির্মাতা। দর্শকদের সমস্ত রকমের আগ্রহ মেটাবার জন্যে এই যে এতোসব রমণীয় দ্রব্যসম্ভার ছড়িয়ে আছে, তা থেকেই বোঝা যায় যে, লেনিনগ্রাদবাসীরা তাঁদের স্থাপত্য-ভাস্কর্যের মহৎ উত্তরাধিকার সম্পর্কে কতখানি গর্ব অনুভব করেন। শুধু অতীতদিনের এইসব ইমারতের স্থাপত্য-সৌন্দর্য, সড়ক আর বীথিপথগুলির বিন্যাস-সৌন্দর্য, পার্কগুলির প্রাকৃতিক লাবণ্যসম্ভারই যে দর্শকদের মন কেড়ে নেয় তাই নয়, লেনিনগ্রাদের একালের বহু বাড়ি-ইমারত, হোটেল-রেস্তোরাঁ, ক্রীড়াঙ্গন-রঙ্গশালা ইত্যাদিও যেন রূপকথার বইয়ের পাতায় ছাপানো রঙীন ছবির মতো সুন্দর। লেনিনগ্রাদের সুবিন্যস্ত ইমারত, প্রশস্ত রাস্তা ও স্কোয়ার, পার্ক, উদ্যান, খাল প্রভৃতির পরিকল্পনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে স্থাপিত স্মৃতিসৌধগুলির স্থাপত্য-বিন্যাস এমন এক একক সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপলাভ করেছে, যা সকলের মনেই গভীর রেখাপাত করে। লেনিনগ্রাদকে বলা হয় পৃথিবীর সর্বপ্রথম শহর, যার সর্বপ্রথম কাঠামো থেকে শুরু করে সব কিছুই নির্মাণ করা হয়েছে পূর্বনির্ধারিত সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা

অনুসারে। শহরটির সুন্দর জ্যামিতিক বিন্যাস সহজেই ভ্রমণকারী-দের মনোযোগ আকর্ষণ করে। লেনিনগ্রাদের প্রধান রাজপথ নেভ্স্কি প্রসপেক্ট। এর রাজপথের সঙ্গেই যুক্ত হয়েছে স্থাপত্য-কলার জন্যে বিখ্যাত আর্টস ও অস্ত্রোভ্স্কি স্কোয়ার দুটি। লেনিনগ্রাদের শহরতলী, তার প্রাসাদ, পার্ক ও ফোয়ারার জন্যে বিখ্যাত। মূল শহরের মোট এলাকার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ জুড়ে রয়েছে পার্ক আর উদ্যান। নিজের বহু রঙ্গমঞ্চ, সঙ্গীতশালা, অপূর্ব সব ঐতিহাসিক ও কলা-সংগ্রহশালা, অতীতের স্মারক কীর্তি, বিগত যুদ্ধের সময়কার বীরত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষার স্মৃতিসৌধ আর সমাজতান্ত্রিক গঠনকার্যে অপূর্ব সব সাফল্যের নিদর্শন নিয়ে এই লেনিনগ্রাদ বন্ধুদের কাছে তার সমস্ত প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যাতে এই মহানগরীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হয়ে উঠতে পারা যায়। নেভা তীরবর্তী শহরের স্থাপত্য-সমৃদ্ধ স্মৃতিসৌধগুলি এবং সমস্ত কিছু, যা একে অননুকরণীয় বৈশিষ্ট্য দিয়েছে, তা দেখে লেনিনগ্রাদের যে-কোন পরিদর্শক অভিভূত না হয়ে পারেন না। লেনিনগ্রাদ দেখতে অনেকটা একটা দ্বীপপুঞ্জের মতো: নেভার ৬০টি শাখানদী, খাল ও নদী একে ১০১টি দ্বীপে বিভক্ত করেছে।

১৪ই নভেম্বর আমরা সমস্ত দিনটি কাটালুম লেনিনগ্রাদ কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও স্থানীয় সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে। কর্পোরেশনে যাওয়ার বিশেষ আগ্রহ ছিলো এই কারণে যে, লেনিন-গ্রাদের বিশেষজ্ঞরাই কলকাতায় পাতাল রেল নির্মাণের ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের সহযোগী। লেনিনগ্রাদ কর্পোরেশনই মেট্রো রেল-এর পরিচালক। ভারতীয় বিশেষজ্ঞরাও লেনিনগ্রাদে এসে পাতাল রেল সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নিয়ে গেছেন। কর্পোরেশনে গিয়ে মেয়র এবং তাঁর সহযোগীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা হলো। লেনিন-গ্রাদে স্থায়ী অধিবাসীর সংখ্যা ২১ লক্ষ। ২১টি জেলাতে বিভক্ত।

মেয়র আমাদের সামনে একটা বিরাট চার্ট রাখলেন, যে চার্টে দেখা গেলো, ১৯৮৫ সালে লেনিনগ্রাদ শহরের কি কি উন্নয়ন হবে তার ছক তৈরী হয়ে আছে। ফিনল্যাণ্ড উপসাগরকে বালি তুলে গভীর ক'রে সেই বালি দিয়ে তৈরী হবে দ্বীপ, আর সেই দ্বীপে বাস করবে মানুষ। লেলিনগ্রাদে মানুষের বসবাসযোগ্য স্থানাভাব পূরণে এ হলো অভিনব ব্যবস্থা। কর্পোরেশন পরিচালনা করেন ৬৫৪ জন সদস্য ; ১ জন সভাপতি, ৭ জন ডেপুটি, ১ জন সেক্রেটারী এবং ১৫ জন সদস্য নিয়ে কর্পোরেশনের কার্যকরী সমিতি হয়। বর্তমানে কর্পোরেশনের সদস্যদের মধ্যে ৩৩০ জন পুরুষ এবং ৩২৪ জন মহিলা। মজুর ৩৭৫ জন, ১০৪ জন কল পরিচালক, ২৫ জন বিজ্ঞানী, চিকিৎসক প্রতিনিধি ১০ জন, ছাত্র ১০ জন, ২২ জন পেনশনভোগী। ৩২৬ জন পার্টি সদস্য, ১২৮ জন নির্দলীয়, ২৫০ জন উচ্চ শিক্ষিত, ৪০ জন উপাধিধারী, বাকী মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রাপ্ত। ডেপুটিদের বয়স ২৫ বৎসরের কম ৭৪ জন, ২৫ থেকে ৩০-এর মধ্যে ৯০ জন, ৩০ থেকে ৪০-এর মধ্যে ১৭০ জন, ৪০ থেকে ৫০-এর মধ্যে ২২০ জন অবশিষ্ট কয়েকজনের বয়স ৫০-এর বেশী। মাসে একবার সোভিয়েত কমিটির বৈঠক বসে। ১৯টি কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষা, অর্থ, পরিবহণ, আইন, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন বিভাগের নীতি নির্ধারণ হয় কমিশনের মাধ্যমে। কর্পোরেশনের কর্মী সংখ্যা হলো ৬,৩৬,০০০। প্রতিটি জেলায় জেলাভিত্তিতে কাজ পরিচালনা করে ২০০ জন করে ডেপুটি। কথা আরম্ভ হলো যানবাহন ও মেট্রোরেল নিয়ে। মেয়র সামগ্রিক ভাবে রাশিয়ার বিভিন্ন শহরের যানবাহন সম্পর্কে আমাদের সংক্ষিপ্ত ভাবে বললেন। বর্তমানে রাশিয়ার ৫টি শহরে আছে ভূ-গর্ভ রেল, ৯১-টিতে ট্রলি বাস, ১১৩টিতে ট্রাম, ১,৮৬৯টি শহর ও জনবসতিতে বাস, আর ট্যাক্সি চলাচল করে প্রায় ১,৫০০টি শহরে। যে সকল ট্যাক্সি "রুট" দিয়ে "মিনিবাস"

চলাচল করে সেগুলি খুব জনপ্রিয়। সোভিয়েত পাতালরেল বিখ্যাত তার কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, উচ্চ গতি আর স্টেশনগুলির স্থাপত্য সৌন্দর্যের জন্যে। ট্রলি বাস জনপ্রিয় হচ্ছে, তার কারণ এতে কোনও শব্দ হয় না আর নির্গত গ্যাসে আবহাওয়া দূষিত করে না। বাসভাড়া যে কোনও দূরত্বে শহরের মধ্যে ৫ কোপেক, ট্রলিবাস ৪ কোপেক, ট্রাম ৩ কোপেক। পাতালরেলের ভাড়াও ৫ কোপেক। সোভিয়েত ইউনিয়নের একটা বিরাট সংখ্যক মানুষ বিনাভাড়ায় ট্রাম-বাস-ট্রলি-ট্রেন ভ্রমণের সুযোগ পায়। সমস্ত স্তরের সোভিয়েতের ডেপুটি, যুদ্ধে পঙ্গু ও শ্রমবীর, এবং পেনশন-ভোগীদের যাতায়াতে কোনও ভাড়া লাগে না। মেয়র অন্যান্য কথার মধ্যে বললেন, গত ১০ বছরে কোনও কর বাড়েনি, কোনও দ্রব্যমূল্যও বাড়েনি। কলকাতার মেট্রো রেল সম্পর্কে তিনি বললেন, তাঁর বিশেষজ্ঞেরা ফিরে এসে তাঁকে যা জানিয়েছেন, তাতে কলকাতা ও বোম্বাইতে মেট্রোরেল খুবই সফল হবে।

সোভিয়েত রাশিয়ার যানবাহন সম্পর্কে এখনও কিছু কিছু অসুবিধা না আছে, তা নয়। যেমন ট্যাক্সির ক্ষেত্রে। সমস্ত ট্যাক্সির মালিক রাষ্ট্র। ট্যাক্সি চালকরা বিভিন্ন শিফ্‌টে ডিউটি করেন। শিফ্‌টে কাজে যোগদানের আগে প্রত্যেককে ডাক্তারী পরীক্ষা করা হয়। এই শিফ্‌ট বদলের সময়েই রাস্তায় ট্যাক্সি পেতে অসুবিধা দেখা দেয় এবং দেরী হয়। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের যানবাহন সম্পর্কে যে তথ্য জেনেছি, তার সার হলো এই—এখন যেমন পঙ্গু, পেনশনভোগী ও বিশেষ সম্মানীয় ব্যক্তিরা বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের সুযোগ পান, ১৯৮০ সালের পর সমগ্র জনপরিবহণ ব্যবস্থা বিনামূল্যে চালু হবে, অর্থাৎ ১৯৭০ থেকে ৮০ সালের মধ্যে জনপরিবহণ ব্যবস্থা যেমন—ট্রাম, বাস, পাতালরেল সোভিয়েত ইউনিয়নের মানুষ বিনা ভাড়ায় ব্যবহার করতে পারবে। এরপর

আমরা লেনিনগ্রাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়ে কিছু তথ্য জানতে পারলাম। বর্তমানে লেনিনগ্রাদে যে ৫ কোটি ৫০ লক্ষ বর্গমিটার গৃহ নির্মাণের স্থান পাওয়া গেছে, তার ৬৫ শতাংশ নির্মিত হয়েছে সোভিয়েত শাসনের আমলে। শহরের পুরাতন অংশের চতুর্দিকে একটার পর একটা নতুন নতুন বাসগৃহ অঞ্চল গড়ে উঠেছে। প্রতিবছর লেনিনগ্রাদে প্রায় ৫৩,০০০ থেকে ৫৫,০০০ ফ্ল্যাট তৈরী হচ্ছে। শহরে এখন ৭০০টি ট্রলিবাস ছাড়াও ২,৫০০ বাসের একটি বহর রয়েছে। গৃহস্থালী ও শিল্পের প্রয়োজন মেটাতে নেভার যে জল ব্যবহার করা হয়ে থাকে, বিশেষজ্ঞের মতে তা মিশ্রণের দিক থেকে খুবই ভালো। শহরে জলের উৎস উন্নত করার ব্যাপারে লেনিনগ্রাদের তিন শতাধিক কলকারখানায় ইতিমধ্যে নিজস্ব বিশুদ্ধীকরণের যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। শহরের বায়ু বিশুদ্ধীকরণের জন্যে কয়লা ও অন্যান্য জ্বালানীর ব্যবহার সীমিত করে গ্যাসের ব্যবহার বৃদ্ধি করে একে সমাধান করার বিষয় চিন্তা করা হচ্ছে। লেনিনগ্রাদ শহরেকে আরও বিস্তৃত, আরও আকর্ষণীয় করার প্রেক্ষিতে যে মাষ্টার প্ল্যান নেওয়া হয়, তার প্রধান বিষয় হলো, সমুদ্র পর্যন্ত শহরকে বিস্তৃত করা এবং লেনিনগ্রাদের চতুর্দিকে বিরাট বনানীযুক্ত পার্ক গড়ে তোলা। লেনিনগ্রাদের সদ্য-উন্নত অঞ্চলগুলি ফিনল্যাণ্ড উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে, উপকূল বরাবর ২৫ কিলোমিটার প্রসারিত হবে। সেখানে পার্ক ও বেলাভূমি ছাড়াও ১৬০ মিটার চওড়া বাঁধ তৈরি করা হবে। লেনিনগ্রাদ শহরের নির্মাতাগণ লক্ষ্য রাখছেন যে শহরে নতুন অঞ্চলগুলি যেন ফিনল্যাণ্ড উপসাগর থেকে দেখা লেনিনগ্রাদের ঐতিহাসিক ছায়া লেকের আকারটির অভাব পূরণে সমর্থ হয়। লেনিনগ্রাদের প্রসারিত সীমারেখাগুলি, সমুদ্রের দিকে তার প্রসার এবং স্থাপত্যকলার স্মৃতিগুলি রাখার প্রয়োজনীয়তা—এই সমস্তই প্রকৃতির শক্তির

বিরুদ্ধে শহরকে রক্ষা করার বিষয়ে লেনিনগ্রাদবাসীদের চিন্তা করতে বাধ্য করছে। নগরনির্মাতা, এঞ্জিনিয়ার এবং অর্থনীতিবিদ্ প্রমুখ বিশেষজ্ঞগণ বহু প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করার পর ফিনল্যাণ্ড উপসাগরে ২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনাই সব থেকে ভালো বলে স্থির করেন। কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের নামাঙ্কিত এই শহরেই তাঁর কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়েছে।

লেনিনগ্রাদ পত্রিকার দপ্তরে পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধির সঙ্গে আমাদের বৈঠকটি হলো বেশ কিছুটা কবির লড়াইয়ের মতো। লেনিনগ্রাদ পত্রিকার প্রতিনিধি তাঁর সুদীর্ঘ বক্তব্যে আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করলেন, ভারতের প্রতি সোভিয়েত জনগণের ভালবাসা কতো গভীর, সোভিয়েত রাষ্ট্রনায়করা ভারতের সামগ্রিক উন্নতিতে কতো বেশী আগ্রহশীল, সোভিয়েত ইউনিয়ন কিভাবে বিপদের দিনে ভারতের পাশে দাঁড়ায়—এইসব কথাগুলি বললেন মিঃ ব্রেজনেভের আসন্ন ভারত সফরের পটভূমিতে। আমরা দু'জন জবাবী ভাষণ দিলাম; যাকে বলে ওপরচাপ্‌পা ভাষণ। আমরা বললাম, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের বন্ধু, সুহৃদ রাষ্ট্র; কিন্তু এই বন্ধুত্ব ও সৌহার্দের সেতু তো রচনা করেছি আমরাই। ভারতের বিপ্লবীরা সেই ১৯১৭ সালে এমন কি তার আগে থাকতেও অনেকে ফাঁসির মঞ্চ ও জেলের প্রাচীরকে অগ্রাহ্য করে সাত-সমুদ্দুর পেরিয়ে চলে এসেছিলেন রুশ দেশে। বিদেশে বসে মাতৃভূমির মুক্তি ও সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি এই রুশ দেশে বসে চালিয়েছেন। এই সোভিয়েত ইউনিয়নেই ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির গোড়াপত্তন হয়েছিলো। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, মানবেন্দ্রনাথ রায়, অবনী মুখোপাধ্যায়, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ফিরোজ উদ্দীন মনসুর,

বীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, ফজল ইলাহি কুরবান, সওকত উসমানী, নলিনী গুপ্ত, রফী আহম্মদ, রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, বরকতুল্লাহ প্রমুখ বীর-বিপ্লবীরা এই রুশ দেশের মাটি থেকেই ভারতের মুক্তি যুদ্ধের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছেন। স্বয়ং লেনিন ও স্তালিন ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে এই বিপ্লবীদের মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ যখন নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতি, তখন লেনিন ও স্তালিনের সঙ্গে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিলো। স্বয়ং লেনিন ১৯২২ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের চতুর্থ কংগ্রেসে প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করার জন্য ৫ জন ভারতীয়কে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করেছিলেন। তাঁদের নামগুলি খুবই উল্লেখযোগ্য : (১) মানবেন্দ্র নাথ রায়, (২) শ্রীপদ্ অমৃত ডাঙ্গে, (৩) নলিনী গুপ্ত, (৪) সুভাষ চন্দ্র বসু, (৫) চিত্তরঞ্জন দাশ।—এঁদের মধ্যে রায় তখন কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের একজন প্রতিষ্ঠিত নেতা। ডাঙ্গে এবং নলিনী গুপ্ত যথাক্রমে বোম্বাই ও বাংলার নবজাত কমিউনিস্ট সংগঠনের মুখপাত্র হিসাবে আমন্ত্রিত। কিন্তু বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ তরুণ বামপন্থী জাতীয়তাবাদী নেতা সুভাষচন্দ্র ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে আমন্ত্রণ জানানো। তারপর বললাম রবীন্দ্রনাথের কথা ; যিনি রাশিয়া দেখে ফিরে গিয়ে জীবন-সায়াহ্নেও নতুন চিন্তাভাবনায় উদ্দীপ্ত হয়েছিলেন। বললাম পণ্ডিত নেহরুর কথা ; যিনি ভারত-সোভিয়েত মৈত্রীকে নতুন ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

রুশ সাংবাদিক ভারত-সোভিয়েত বন্ধুত্বের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করে বললেন, ১৯৪৭ সালের ১৩ই এপ্রিল ভারত-সোভিয়েত কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষরা তখনই ঘটনাটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব বুঝতে পারেন। পৃথিবীর দুটি বৃহত্তম দেশের এই

বন্ধুত্ব স্থাপনের ঘটনাটির সুদূরপ্রসারী চরিত্র সেদিন সকলেই বুঝতে পেরেছিলেন। ইতিপূর্বে রাষ্ট্রসংঘে দক্ষিণ আফ্রিকার জাতিবিদ্বেষ, অছিপ্রথাধীন অঞ্চল এবং অন্যান্য প্রশ্নে দু'দেশের মধ্যে যে সহযোগিতা গড়ে উঠেছিলো, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রশ্নে এই মতৈক্য পারস্পরিক বিশ্বাস অর্জনে সাহায্য করে মৈত্রীর পথ বাধাহীন করে তোলে। ১৯৪৭-১৯৫৫ পর্যায়টি নানাদিক থেকে ভারত তথা পৃথিবীর পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময় কোরিয়ার যুদ্ধ পৃথিবীর নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। সাম্রাজ্যবাদ বিভিন্ন সামরিক জোট গড়ে তুলতে থাকে, কমিউনিজম এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বিরুদ্ধে সাঁজোয়া তৎপরতা চালাবার উদ্দেশ্যে। এই বিষাক্ত আবহাওয়া দূরীকরণ এবং শান্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে ভারত একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কোরিয়ার যুদ্ধ বিরতির জন্য রাষ্ট্রসংঘে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রস্তাবের প্রতি ভারত তার সমর্থনের কথা জানায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের বিরুদ্ধে যে বিভিন্ন সামরিক জোট তৈরি করা হয়, ভারত তা প্রত্যাখ্যান করে। ভারতের এই প্রগতিশীল রাজনৈতিক অবস্থান সোভিয়েত জনগণের গভীর সমর্থন লাভ করে। এইভাবে সোভিয়েত ভারতের স্বপক্ষে এসে দাঁড়ায় এবং ভারত-সোভিয়েত সম্পর্ক নিবিড় হয়ে উঠতে থাকে। পশ্চিম সম্বন্ধে এশিয়ার দেশগুলি ক্রমেই বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ছিলো। ১৯৫৫ সালের বান্দুং সম্মেলনে এশীয় দেশগুলির এই মনোভাব স্পষ্টভাবে প্রকাশ লাভ করে। জওহরলাল নেহরু ইতিমধ্যেই ভারতের জোট-নিরপেক্ষতার আদর্শের কথা বিশ্ববাসীকে জানান। সাম্রাজ্যবাদী মহল থেকে সেদিন নানা রকম কথা শোনা গিয়েছিলো। কিন্তু জোট-নিরপেক্ষতার বলিষ্ঠ কার্যক্রমকে তারা বিঘ্নিত করতে পারেনি। জোট-নিরপেক্ষতার আদর্শ এবং এই পথে এগিয়ে যাবার জন্য

ভারতের দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে নেহরু সামরিক জোট সৃষ্টির সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের নিন্দা করেন এবং পারমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র বাতিল করে দেবার দাবি জানান।

একটি শান্তিকামী দেশ হিসাবে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ইন্দোচান সম্পর্কিত ১৯৫৪'র জেনেভা সম্মেলনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতি তদারক করার জন্য নিরপেক্ষ দেশগুলির যে কমিশন গঠন করার কথা হয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন তাতে ভারতের নাম প্রস্তাব করে। ১৯৫৪ সালের জুলাই মাসে প্রাভদায় পঞ্চশীলের আদর্শকে স্বাগত জানানো হয়—যার নীতিসমূহের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। এইভাবে বিভিন্ন প্রগতিশীল সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে দুই দেশ পরস্পরকে ভালোভাবে জানতে শেখে এবং শান্তির জন্য এই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে দুই দেশের বন্ধুত্বের বনিয়াদ সুদৃঢ় হয়। ১৯৫৩ সালে প্রথম দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হয়, যদিও এর বিনিময়ের পরিমাপ ছিলো মাত্র ১·৩ কোটি টাকা। বর্তমানে এই অঙ্ক বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪০০ কোটি টাকায়। এর থেকেই প্রমাণিত হয়—ভারত-সোভিয়েত অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং বন্ধুত্ব কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫৫ সালে এই সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব আরও প্রসার লাভ করে। ১৯৫৫ সালে ২রা ফেব্রুআরিতেই ভিলাই ইস্পাত কারখানা গড়ে তোলবার চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৫৫ সালের জুন মাসে জওহরলাল নেহরুর সোভিয়েত সফর ভারত-সোভিয়েত সম্পর্ককে গভীর বনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে। যুগান্তকারী একটি যুক্ত ইস্তাহারে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ভিত্তিতে দুই দেশের

মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে তুলবার প্রত্যয় এই যুক্ত ইস্তাহারে প্রকাশিত হয়। ১৯৫৫ সালের নভেম্বর মাসে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের ভারত সফর দুই দেশের মৈত্রী-বন্ধনকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। ১৯৫৭ সালের গুরুত্বপূর্ণ ভারত-সোভিয়েত চুক্তির দ্বারা সোভিয়েত সহায়তায় রাঁচির ভারী মেশিন নির্মাণের কারাখানা, দুর্গাপুরের খনি এবং অন্যান্য মেশিন তৈরীর কারখানা, বিশেষ কাঁচ তৈরীর কারখানা, নেভেলি তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কোরবার বৈদ্যুতিক এবং কারিগরি যন্ত্রপাতি তৈরীর কারখানা এবং আরও বহু প্রকল্পের পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

ভারতের অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জনের সংগ্রামে সোভিয়েত সাহায্য বিশেষ প্রয়োজনীয় একটি ভূমিকা গ্রহণ করেছে। পশ্চিমের ওপর নির্ভরতা কমে যাওয়ায় ভারতের জোট নিরপেক্ষতার আদর্শ আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৯৫৬ সালের সুয়েজ সংকটে মিসরের সমর্থনে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের অবস্থানে উল্লেখযোগ্য মতৈক্য দেখা যায়। ১৯৫৯ সালের মে মাসে ভারত-চীন সংঘর্ষের প্রশ্নে সোভিয়েত ইউনিয়ন জানায় যে শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা উচিত। চীনের মতে সোভিয়েত প্রতিক্রিয়া ছিল "উদ্দেশ্যপ্রণোদিত," কিন্তু নেহরু এই প্রতিক্রিয়াকে "ন্যায্য" বলে বর্ণনা করেন। ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বেলগ্রেডে জোট-নিরপেক্ষ সম্মেলন থেকে ফেরার সময় নেহরু সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করেন। এই সফরের সময় তিনি নানান সমস্যা সম্বন্ধে সোভিয়েত অবস্থানের প্রতি সমর্থন জানান। ১৯৬১ সালের ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি লিওনিদ ব্রেজনেভ ভারত সফরে এসেছিলেন। এই বছরই ভারতের উপনিবেশবাদের শেষ চিহ্ন—গোয়া, দমন ও দিউ থেকে চিরতরে মুছে ফেলা হয়। পোর্তুগালের সমর্থনে সাম্রাজ্যবাদী

দেশগুলি একজোট হয়ে রাষ্ট্রসংঘে ভারতকে আক্রমণকারী বলে চিহ্নিত করতে চেষ্টা করে। কিন্তু সোভিয়েত-ভেটো ভারত-বিরোধী সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দেয়।

১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন সুস্পষ্ট ও ন্যায়সঙ্গত নীতি অবলম্বন করে। ১৯৬২ সালের ২৫শে অক্টোবর এবং ৫ই নভেম্বরে প্রকাশিত প্রাভদার দুটি সম্পাদকীয়তে যথাক্রমে অবিলম্বে যুদ্ধ বিরতি ঘটিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে বিরোধের মীমাংসার আহ্বান এবং রক্তপাত বন্ধের দাবি জানানো হয়। সোভিয়েতের এই নীতি ছিলো ভারতের কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এই নীতির দ্বারা কার্যতঃ জওহরলাল নেহরুর সরকারকেই সমর্থন করা হয়েছিলো। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত সংঘর্ষের সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সোভিয়েত গভর্নমেণ্ট যে ন্যায়সঙ্গত নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তার রাজনৈতিক তাৎপর্য গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬৫ সালের ১০ই ডিসেম্বর কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির জেনারেল সেক্রেটারী ব্রেজনেভ বলেছিলেন, "ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যা ঘটছে, সে সম্পর্কে আমরা মোটেই উদাসীন নই, ভারতের সঙ্গে আমরা বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। সেটা একটা ঐতিহ্য হয়ে উঠেছে। ভারতের শান্তিপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতি, গোষ্ঠী নিরপেক্ষতার প্রতি তার ন্যায়সঙ্গত আনুগত্য এবং তার জাতীয় স্বাধীনতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার নীতি—এসবের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাবান এবং আমরা তার গুণগ্রাহী। স্বাধীনতা, শান্তি ও প্রগতির পথে ভারতের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে সোভিয়েতের মানুষ যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন।··· সেখানে তৃতীয় শক্তির আবির্ভাব ঘটতে পারে এবং ঘটেছেও। তারা ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের অবনতিতে খুশী হয়ে সেই সুযোগে

নিজেদের মতলব হাসিলের প্রয়াস পেতে পারে এবং কখনও কখনও সেই বিরোধের আগুনে ঘৃতাহুতিও দিতে পারে।...এটা বুঝতে কোনও কষ্ট নেই যে, দুটি রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে পড়বে এবং যারা এশিয়ার এই দুটি বৃহৎ শক্তিকে তাঁবেদার করার স্বপ্ন দেখছে, তাদেরই হাতের ক্রীড়নক হয়ে আবার বিদেশী শক্তির প্রভাব এবং হুকুমের কবলে পড়ে যাবে।...আমরা অপর রাষ্ট্রের ঘরোয়া ব্যাপারে নাক গলাতে চাই না। আমরা মনে করি, ভারত ও পাকিস্তানের গভর্নমেন্টই এই বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে সক্ষম এবং বিরোধ মিটিয়ে ফেলার চেষ্টাই তাদের করা উচিত। কিন্তু সোভিয়েত জনগণ আন্তরিকভাবে এই আশাই পোষণ করেন যে, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে যে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠেছে, সেটা অবিলম্বে নির্বাপিত হওয়া দরকার। সোভিয়েত ইউনিয়ন ইতিমধ্যেই সরকারীভাবে ঘোষণা করেছে যে, সেই উদ্দেশ্যে সাধনের জন্য ভারত ও পাকিস্তান যে সাহায্যই সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে চান না কেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন সেই সাহায্য প্রদানের জন্য সব সময়ই প্রস্তুত আছে।"

ব্রেজনেভের এই বিবৃতি বিশ্বের জনমানসে দারুণ প্রভাব বিস্তার করে এবং সেটা যে দক্ষিণ এশিয়ায় যুদ্ধ বন্ধের সহায়ক হয়েছিলো সেকথা বলাই বাহুল্য। ১৯৬৬ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণের অল্পকাল পরেই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিদর্শন করেন। ১৪ই জুলাই মস্কোর সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী সমিতির এক সভায় শ্রীমতী গান্ধী বলেন যে, "আপনাদের ত্রয়ো-বিংশতি পার্টি কংগ্রেসে সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের যে বিচারবুদ্ধি ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া গেছে, তার প্রতি ভারতের জনগণ ও সরকার গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করেন।" পশ্চিমের উস্কানি এবং মাওবাদীদের অপপ্রচার সত্ত্বেও সোভিয়েত-ভারত

বন্ধুত্ব ক্রমেই শক্তিশালী হচ্ছে। ১৯৬৯ সালে ব্রেজনেভ এশীয় যৌথ নিরাপত্তার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্বিংশতি কংগ্রেসে প্রদত্ত রিপোর্টে, সোভিয়েত ইউনিয়নের ট্রেড ইউনিয়নগুলোর পঞ্চদশ কংগ্রেসে এবং সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রসমূহের পঞ্চদশ বার্ষিকী অনুষ্ঠানে প্রদত্ত রিপোর্টে ব্রেজনেভ এই প্রস্তাব আর বিশ্লেষণ করেন।

১৯৭১ সালের ৯ই অগস্ট ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে শান্তি, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার মধ্যে দিয়ে চতুর্বিংশতি কংগ্রেসের নীতির আরও বিকাশ ঘটে। ১৯৭১ সালের ২৭-২৯শে সেপ্টেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সরকারীভাবে মস্কো সফরে আসেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির জেনারেল সেক্রেটারী ব্রেজনেভ, সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রিম সোভিয়েতের প্রিসিডিয়ামের প্রেসিডেন্ট এন. ভি. পদগোর্নি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধান মন্ত্রী এ. এন. কোসিগিনের সঙ্গে শ্রীমতী গান্ধীর আলোচনা হয়। ভারত-সোভিয়েত যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়, "উভয়পক্ষই এবিষয়ে একমত যে, ভারত-সোভিয়েত চুক্তি উভয় দেশের পক্ষেই একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং দুই দেশের মধ্যে যে আন্তরিক বন্ধুত্ব, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং সৎ-প্রতিবেশীসুলভ সহযোগিতা বিদ্যমান, তা এই চুক্তির দ্বারা আরও শক্তিশালী হয়েছে। এই চুক্তি সম্পাদনের মধ্যে দিয়ে এটাই প্রমাণিত হলো যে, ভারত-সোভিয়েত বন্ধুত্ব, কোনও ক্ষণস্থায়ী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। উভয় দেশের জনগণের দীর্ঘমেয়াদী মৌলিক স্বার্থই এই বন্ধুত্বের বনিয়াদ।"

১৯৭১ সালে যখন ভারতীয় উপমহাদেশে রণদামামা বেজে ওঠে তখন ভারত-সোভিয়েত চুক্তির তাৎপর্য ভারতের মানুষ ও বাংলাদেশের মানুষ ভালো করে উপলব্ধি করতে পারেন। এখন

ভারত ও সোভিয়েত সম্পর্ক শান্তি, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠতরই হবে। শ্রী ব্রেজনেভের আসন্ন ভারত সফর এই বন্ধুত্বের দুর্গকে আরও শক্তিশালী করবে।

সোভিয়েত সাংবাদিক এই সুদীর্ঘ ইতিবৃত্ত আমাদের কাছে রাখলেন দীর্ঘ আলাপনের মধ্যে দিয়ে। আমরা বুঝলাম, একজন ভারতীয় সাংবাদিক এবং একজন সোভিয়েত সাংবাদিকের মধ্যে তফাৎ কতটা। আমরা নিঃসন্দেহে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী বা অন্য যে-কোন দেশের সঙ্গে ভারতের মৈত্রী সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, কিন্তু এইভাবে ঘটনা পরম্পরায় এবং ঠিকুজী-কুলজী-কোষ্ঠী দিয়ে নিশ্চিতভাবে অনর্গল বলতে পারবো না—কবে, কোন দিন ভারত সেই দেশ সম্পর্কে কি বলেছে ও কি করেছে। কিন্তু আমরা হার মানিনি সোভিয়েত সাংবাদিকের কাছে। সোভিয়েত সাংবাদিক ভারতের প্রতি সোভিয়েত রাশিয়ার বন্ধুত্ব-সহযোগিতার যে দীর্ঘ ইতিবৃত্ত রাখলেন, আমারা শুধু একটি কথায় সোভিয়েত সাংবাদিককে বুঝিয়ে দিলাম, তোমাদের সাধ্য আছে, তাই সাধ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ভারতের জন্য অনেক কিছু করেছো; কিন্তু আমরা কি করেছি জানো?—আমরা কলকাতার মানুষ, কলকাতা শহরের বুক থেকে সমস্ত বিদেশীদের প্রতিমূর্তি একটির পর একটি উপ্‌ড়ে ফেলে কলকাতা থেকে অনেক দূরে ব্যারাকপুর লাটবাগানে রেখে দিয়েছি। সম্প্রতিকালে কলকাতায় তিনটি প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একটি শহীদ ক্ষুদীরাম বসুর, একটি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের, আর একটি মহামতি লেনিনের। কলকাতার মানুষ সব বিদেশীদের প্রতিমূর্তি তুলে ফেলে একজন মাত্র ভিন্‌দেশীর প্রতিমূর্তিকে কলকাতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান—চৌরঙ্গী অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করেছে—সে মূর্তি লেনিনের। এরপর লেনিনগ্রাদ পত্রিকার সাংবাদিক বন্ধুর মুখে আর কথা যোগায়নি, সে শুধু বিস্ময়ের সঙ্গে বলেছিলো, "সত্যি?"

হোটেল লেনিনগ্রাদে ফিরে এসে রেস্তোরাঁয় গেলাম। রেস্তোরাঁ অবশ্য নিজের ঘরের দরজা খুললেই সামনে পড়ে। হোটেল লেনিনগ্রাদের প্রতি তলায় একটি করে রেস্তোরাঁ আছে। রেস্তোরাঁয় একটি টেবিল ঘিরে দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে বসেছিলো। মেয়েটি প্রায় চিৎকার করে উঠ্‌লো, "আমাদের টেবিলে আস্থন।" সুন্দর ইংরেজিতে আমাদের অভ্যর্থনা জানালো, তাদের টেবিলে বসবার জন্য। আমরা টেবিলে বসতেই মেয়েটি তার নিজের পরিচয় দিয়ে বললো, "তোমরা নিশ্চয়ই ভারতীয় ?"—অর্থাৎ "রাজ-রীতার" দেশের মানুষ। আমরা বললাম, ভারতীয় নিশ্চয়ই ; তবে আমরা নেহরু ও রবীন্দ্রনাথের দেশের মানুষ। মেয়েটি আমাদের কথার মর্ম ঠিক বুঝলো কি-না, জানিনা—সে তার বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলো। আমরা ইণ্ডীজ এবং "রাজ-রীতা'র দেশের মানুষ। এরপর আরম্ভ হ'ল বাক্যালাপ। ছেলেদুটি রুশভাষায় প্রশ্ন করে, মেয়েটি দো-ভাষী হিসাবে ইংরেজীতে আমাদের কাছ থেকে জবাব শুনে ছেলেদুটিকে আবার বুঝিয়ে দেয়। আমাদের জন্য ছেলে দুটি খাবার আনতে গেলো। দুই প্লেটে নানা রকমারী খাবার, বগলে চারটে দামী মদের বোতল নিয়ে টেবিলের সামনে বসলো। টেবিলে আগেই তিনটি মদের বোতল ছিলো ; তাই বুঝলাম এই চারটি বোতল এসেছে অতিথি আপ্যায়নের জন্যে। প্রমাদ গুণলাম। তারপর বললাম, "মদ আমরা খাই না, মদ আমাদের দরকার নেই।" ওরা তিনজন আঁতকে উঠলো। ওরা যেন মাছকে ডানা মেলে আকাশে উড়তে দেখছে। মেয়েটি বললো, "তোমরা মদ খাওনা ? তবে কি খাও ?"—আমরা তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, ভারতে মদ পানীয় হিসাবে সাধারণ মানুষের খাদ্য নয়। অনেক জায়গায় মদ খাওয়া ও বিক্রি নিষিদ্ধ ও বে-আইনী। আমাদের কথা মেয়েটি তার বন্ধুদের ব্যাখ্যা করে যখন বললো, তখন একটি ছেলে

প্রায় আর্তনাদ করে যা বললো, তার মর্মকথা হ'ল এই,—"উঃ কি দুঃসহ জীবন ভারতীয় মানুষের, কি কষ্ট তাদের, তারা একটু খুশী-মতো মদ খেতে পারে না?—ভারতীয়রা মদ খায়না, তাহলে খায় কি?" অনেকক্ষণ ধরে তাদের প্রাণপণে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, মদ হলো বিলাস দ্রব্য। সাধারণ মানুষের ভোগ্য নয়। তাই যে জিনিস সর্বসাধারণের ভোগ্য হবার যোগ্য নয়, তা নিয়ন্ত্রণে রাখাই সরকারের নীতি। রুশ দেশেও এমনি অনেক জিনিস প্রস্তুত, বিক্রয় নিষিদ্ধ ছিলো। প্রসাধনী ও বিলাসদ্রব্য এমন অনেক আছে, যা প্রস্তুত ও বিক্রয়ে সরকার কোন উৎসাহ দেন না। কিন্তু ভবি ভুলবার নয়। তাদের কথা, "যাহোক, এখন যখন তোমরা রুশ দেশে এসেছো, তখন প্রাণভরে মদ খেয়ে নাও।" বহু চেষ্টা করেও তাদের বোঝাতে পারি নি যে মদ্যপানে আমরা অভিজ্ঞও নই, আমাদের পাকস্থলীও খুব বেশী সহ্য করতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত রফা হ'ল, আমরা একটু হলেও খাবো, তারা আমাদের অনারে সবকটি বোতলই শেষ করবে। এক সময় মেয়েটি আমার নাম জিজ্ঞাসা করে যখন শুনলো, "র-নে-ন", তখন সে খিল খিল করে হেসে বললো, "ও, তুমি তাহলে রোমীও? কিন্তু তোমার জুলিয়েট কোথায়?"—নিজের কথায় নিজেই হাসতে লাগলো আর অবলীলাক্রমে একটির পর একটি গ্লাস তরল পানীয় শেষ করলো। অনেক দিন আগের কথা, পশ্চিমবঙ্গের একজন রাজনৈতিক মহিলা নেত্রীর সঙ্গে নির্বাচনী সফরে বেরিয়ে দেখেছিলাম, যখনই সময় সুযোগ পেতেন তিনি একটি করে দামী সিগারেট বের করে নিমেষে কয়েকটানে শেষ করে ফেলতেন। সেদিন অবাক হয়েছিলাম, একজন মহিলার সিগারেট খাওয়ার বহর দেখে। আর আজ ঘণ্টা আড়াই বসে দেখলাম একটি মেয়ের মদ খাওয়া।

এখানে শয়ান লেনিনগ্রাদবাসীরা,
এখানে শয়ান নর-নারী শিশু ;
আর তাঁদের পাশে শুয়ে রয়েছেন সেই
সৈন্যরা যাঁরা
তোমার প্রতিরক্ষায় প্রাণ দিয়েছেন
হে বিপ্লবধাত্রী লেনিনগ্রাদ !
আরো যেসব মহৎ নাম তালিকায় কুলোয় না,
এই পাথুরে গাঁথুনির তলায় শয়ান তাঁরা যে
কতো শত !
কিন্তু এই শিলার দিকে এখন যারা চেয়ে আছে
তারা জেনে রাখো—
এঁদের কাউকেই আর কোনো কিছুকেই
আমরা ভুলিনি !

পিসকারেভস্কি স্মারক সমাধিক্ষেত্রে উৎকীর্ণ মহিলা কবি ওলগা বেরঘোলৎস-র এই কবিতাটি শুধু লেনিনগ্রাদবাসী বা রুশবাসী নয়, বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের মনের কথা। পৃথিবীর ইতিহাসে লেনিনগ্রাদ অমর, লেনিনগ্রাদ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তার প্রতিরোধ কাহিনীর মধ্যে। আমরা পিসকারেভস্কি স্মারক সমাধিক্ষেত্রে যখন গেলাম, তখন বৃষ্টি পড়ছে বেশ জোরে ; বৃষ্টি মানে বরফ-বৃষ্টি। সমাধিগুলি বরফে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে, তার মধ্যেও অজস্র মালা জমা হয়েছে। একটা অনির্বাণ শিখা প্রজ্বলিত রয়েছে অদূরে। অজস্র গোলাপ ফুলের গাছে সমাধি ক্ষেত্রটি ঘেরা। গাছগুলিকে বরফের হাত থেকে বাঁচাতে তালপাতার মতো একরকম পাতা দিয়ে ঠোঙা তৈরি করে ঢেকে রাখা হয়েছে। প্রায় ৫ লক্ষ বীর লেনিনগ্রাদবাসী শায়িত রয়েছেন—এই সমাধি-ক্ষেত্রে। চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম অনেকক্ষণ। বিশেষ কোনও

দৃশ্য নয়, আকর্ষণ সৃষ্টির মতো খুব বেশী কিছু নেই, তবু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা করে এক দৃষ্টে। লেনিনগ্রাদ যুদ্ধের কাহিনী ইতিহাসে পড়েছি; যে কাহিনী সেদিন শুধু বিস্ময়-বিমূঢ় করে দিত, আজ সেই কাহিনীর কেন্দ্রভূমিতে দাঁড়িয়ে অনুভব করছিলাম, লেনিনগ্রাদ-বাসীর সেদিনের যুদ্ধজয়ের কাহিনী, মৃত্যুবরণের কাহিনী। ১৯৪১ সালের ২২শে জুন যুদ্ধ ঘোষণা ছাড়াই হিটলার বিশ্বাসঘাতকতা করে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করেছিল। ফ্যাসিস্ট দস্যুরা লেনিনগ্রাদের দেওয়াল পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল এবং ১৯৪১ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর তারা শহরের চারপাশে অবরোধ রচনা করেছিল, সোভিয়েত দেশের বাকি অংশের সঙ্গে লেনিনের এই শহরের সকল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। শত্রুর মতলব ছিল শহরের গলাটিপে তাকে দুর্ভিক্ষের কবলে ফেলা। ১৯৪৩ সালের ১৮ই জানুআরি বিপুল প্রয়াস ও ইচ্ছাশক্তির বলে শহরের নাগরিক ও সোভিয়েত সৈন্যরা ৯০০ দিনের এই অবরোধ চূর্ণ করেন। ৯০০ দিন অবরোধের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন সময় গেল ১৯৪১ সালের নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ১৯৪২ সালের জানুআরি পর্যন্ত। যোগাযোগের একমাত্র পথ ছিল লাগোদা হ্রদের ওপর দিয়ে। কিন্তু সেখানে না ছিল জেটি, না ছিল কুলে ভেড়ার পথ, বজরা বা গাধাবোট। খাদ্য সরবরাহ তখন বাঁচা-মরার প্রশ্ন হয়ে উঠলো। লাগোদা হ্রদের ওপর দিয়ে শীত-কালীন রাস্তার ওপরই তখন মানুষের যা কিছু আশা-ভরসা। এই অবরোধের সময়ে রণাঙ্গনে বা হাসপাতালে সশস্ত্র বাহিনীর যাঁরা মারা গিয়েছিলেন এবং শত্রুর বোমায় নিহত নাগরিকবৃন্দ ছাড়াও ৬ লক্ষ ৪১ হাজার লোক অনাহারে মারা গিয়েছিলেন।

লেনিনগ্রাদের সমগ্র জনসংখ্যাই সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। লেনিনগ্রাদবাসীদের শক্তির উৎস কি, তা শত্রু বুঝতে পারে নি। তারা বুঝতে পারেনি যে, রুশ জনগণ সোভিয়েত

ক্ষমতার আমলে পরিণত হয়ে উঠেছে, যৌথ জীবন ও শ্রমে বিপুল অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। তাই লেনিনগ্রাদে অবরোধের "পরি-মার্জিত" অত্যাচার সত্ত্বেও সোভিয়েত মানুষ বিচলিত হননি, তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও অভ্যাস পরিবর্তন করেন নি। বরঞ্চ এগুলি আরও পরিস্ফুট আরও শক্তিশালী হয়েছে। লেনিনগ্রাদবাসীদের অবিচলতা কেবল অনমনীয় রুশ মনোভাবেরই প্রতিফলন নয়, সোভিয়েত মনোভাবেরও বটে।

শহরের দিকে এগিয়ে আসছিল জার্মান "উত্তর" সেনাদল। "উত্তর" সেনাদল "মধ্য" নামক আর একটা নাৎসী সেনাদলেব সঙ্গে একত্রে আক্রমণ করছিল। এর ওপর আবার হিটলারপন্থীদের ফিনল্যাণ্ডের মিত্ররাও লেনিনগ্রাদ রণাঙ্গনের আক্রমণাত্মক অভিযানে যোগ দিয়েছিল। হিটলার "উত্তর" সেনাদলের নেতৃত্বের ভার দিয়েছিল ফিল্ড মার্শাল ফন লিব-এর ওপর। ফন লীব নিশ্চিত ছিল যে লেনিনগ্রাদের প্রবেশদ্বারে আত্মরক্ষামূলক লড়াইয়ে ক্ষীয়মাণ সোভিয়েত সেনাদল নাৎসী ডিভিশনের নতুন আক্রমণের সামনে টিঁকে থাকতে পারবে না। লেনিগ্রাদের পতন উপলক্ষে সেখানকার হোটেল আস্তোরিয়াতে ভোজসভার দিন পর্যন্ত ঠিক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু নাৎসী ফিল্ড মার্শালের হিসাবে ভুল হয়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিপুল সংগঠনী ক্রিয়াকলাপ নাৎসী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে নিঃস্বার্থ সংগ্রামী লালফৌজ ও শহরের অধিবাসী অটুট ঐক্যের নিশ্চয়তা সৃষ্টি করেছিল। পুলকোভো হাইটস-এর দিক থেকে শত্রু ঢুকে আসবার বিপদ ছিল সবচেয়ে বেশী। পুলকোভো হাইটস-এ ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়েছিল। নাৎসী সৈন্যরা বারংবার ট্যাঙ্ক ও বিমান বাহিনীর সহায়তায় পুলকোভো হাইটস আক্রমণ করলেও প্রত্যেকবারই বিপুল ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে তাদের পিছু হঠতে হয়েছিল।

সোভিয়েত রক্ষীরা অসীম সাহস দেখিয়েছিলেন। লেনিনগ্রাদবাসীরা তাঁদের বিপুল সহায়তা করেছিলেন। সৈন্যবাহিনী ও জনগণের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি যে ঐক্য সৃষ্টি করেছিল, তার ফলে সোভিয়েত শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। সোভিয়েত প্রতিরক্ষাব্যূহ ভেদ করার জন্য নাৎসীরা যেসব আক্রমণ করেছিল, সে সমস্ত প্রতিরুদ্ধ হ'ল। তাদের বিজয়গর্বে শহরে প্রবেশ করার সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হ'ল, ফন লীবকে হোটেল আস্তোরিয়ায় বহুবিজ্ঞাপিত ভোজসভার প্রস্তাব বাতিল করতে হ'ল। কিন্তু শহর তখনও অবরুদ্ধ। দেশের বাকী অংশের সঙ্গে মাটির ওপর দিয়ে সংযোগ বিপর্যস্ত হবার দরুন জনসংখ্যা ও সৈন্যবাহিনীর দৈনিক সরবরাহ ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল, শহরের ওপর গোলাবর্ষণ ও বিমানহানা অব্যাহত রইলো।

সোভিয়েত উচ্চতম কর্তৃত্ব লেনিনগ্রাদের অবরোধ ভাঙার জন্য এক অভিযান পরিচালনা করা ঠিক করলেন। স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে নাৎসীদের পরাজয় মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের ইতিহাসে যে মোড় ঘুরিয়েছিল—এই অভিযানের সাফল্যের পক্ষে তা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই অভিযানের পরিকল্পনা অনুযায়ী ঠিক হ'ল যে লেনিনগ্রাদ ও ভলখভ রণাঙ্গনের সৈন্যবাহিনী একত্র হয়ে শত্রুব্যূহ ভেদ করবে এবং লাগোদা হ্রদে অবস্থিত শত্রুবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করবে। ১৯৪৩ সালের ১২ই জানুআরি সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী সমস্ত দিক সতর্কভাবে বিচার করে ও পুরো প্রস্তুত হয়ে শত্রুঘাঁটি-গুলোর ওপর বিদ্যুৎবেগে আক্রমণ করলো। ভয়ঙ্কর সোভিয়েত গোলাবর্ষণ দাম্ভিক নাৎসীবাহিনীকে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য করলো। ১৮ই জানুআরির দিন শেষে লেনিনগ্রাদ ও ভলখভ রণাঙ্গন সংযুক্ত হলো। এগারো কিলোমিটার চওড়া এই "করিডর" দিয়ে দেশের বাকী অংশের সঙ্গে লেনিনগ্রাদের ভূ-সংযোগ আবার শুরু হলো।
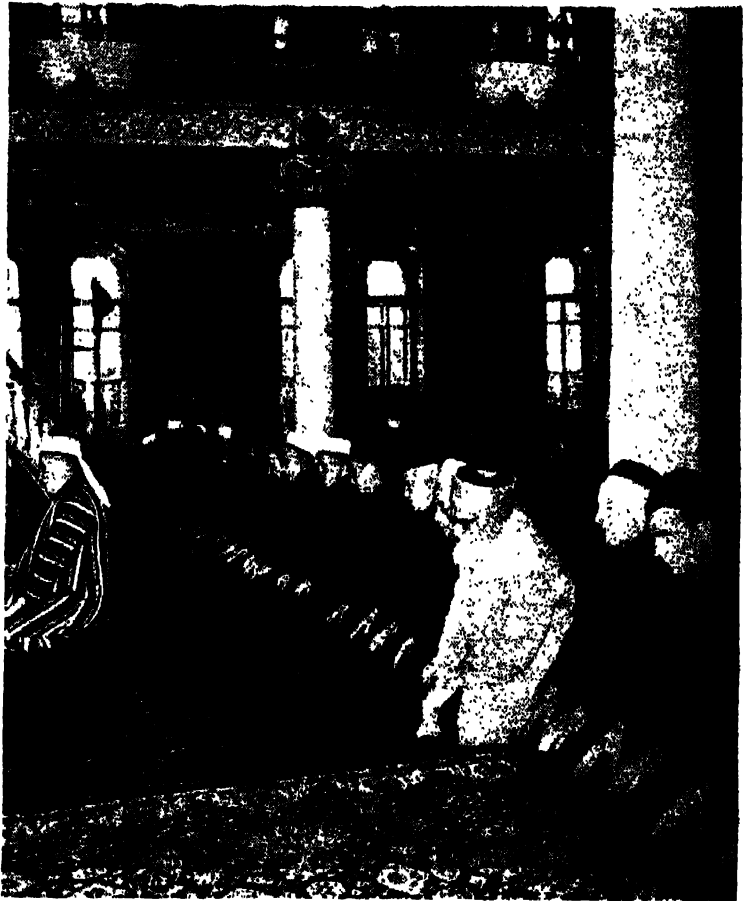
সোভিয়েত দেশে ধর্মীয় স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত।
ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা নমাজ পড়ছেন মসজিদে

সোভিয়েত খামারে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষের দৃশ্য

পিসকারেভস্কি স্মারক সমাধি মিউজিয়মে বারো বছরের একটি মেয়ের ডায়েরীর একটি পৃষ্ঠা বড় ফোটোকপি টাঙিয়ে হয়েছে। এই মেয়েটির নাম তানিয়া সাভিচেভার। তানিয়া ১৯৪১ সালের যুদ্ধের দিনগুলির কথা লিখে রেখেছে তার এই ডায়েরীতে। সাভিচেভাররা থাকতো ভ্যাসিলিয়েভস্কি দ্বীপে। লেনিনগ্রাদ অবরোধের ৯০০ দিনের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন সময় ছিল ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাস থেকে ফেব্রুআরি মাস পর্যন্ত। ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা, শত্রুর গোলাগুলি, তারচেয়ে ভয়ঙ্কর ছিল অনাহার। তানিয়া সেই সময় তার ডায়েরীতে লিখছে একের পর এক মৃত্যুর দিন আর মৃতের পরিচয়। তানিয়া তার ডায়েরীতে লিখেছে, "আমার ভয় করছে, বোমা পড়ছে। ১৯৪১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর দুপুর সাড়ে বারোটায় ঝোনয়া মারা গেল। ঠাকুমা মারা গেলেন ১৯৪২ সালের ২৫শে জানুআরি বেলা তিনটায়। লিয়োকা মারা গেল ১৯৪২ সালের ১৭ই মার্চ ভোর পাঁচটায়। ভাসিয়া খুড়ো মারা গেলেন ১৯৪২ সালের ১৩ই এপ্রিল রাত দুটোয়। লিওসা খুড়ো মারা গেলেন ১৯৪২ সালের ১০ই মে বিকাল চারটায়। মা মারা গেলেন ১৯৪২ সালের ১৩ই মে সকাল সাড়ে সাতটায়।"—বিয়োগান্ত কাহিনীর চূড়ান্ত পর্যায়ের মতো শেষ লেখাটা হলোঃ "সাভিচেভরা মারা গেল, সবাই মারা গেল, রইলো কেবল তানিয়া…।" এরপর তানিয়া মারা যায় ; কিন্তু লিখে যেতে পারেনি তার নিজের মৃত্যুর লগ্ন। বেঁচে ছিল তানিয়ার এক বোন নিনা সাভিচেভা। নিনা সাভিচেভা একটা কারখানায় কাজ করতো, তাই সে রয়ে গিয়েছিল সেই কারখানার মধ্যেই। ১৯৪৫ সালে নিনা ফিরে এসেছিল নিজের বাড়িতে। কাউকে খুঁজে পায়নি, সকলেই মারা গেছে। খুঁজে পেয়েছিল বোন তানিয়ার এই ডায়েরীটি। এই ডায়েরীটি রক্ষিত আছে এই মিউজিয়মে। মিউজিয়মের দেওয়ালে খোদিত আছে "শতাব্দীর

পর শতাব্দী কেটে যাবে, কিন্তু লেনিনগ্রাদবাসীরা—এই শহরের প্রতিটি নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-শিশু—যে আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠ থেকেছেন, তা দূরতম পুরুষদের স্মৃতি থেকে কোনদিনও মুছে যাবে না।" লেনিনগ্রাদের এই সমাধিক্ষেত্র, এই স্মারক সংগ্রহশালা, এখানকার নৈঃশব্দ্য সব কিছুর মধ্যে মনে পড়ে সেই বিশ্বযুদ্ধের স্মৃতি ; মনে পড়ে ৯০০ দিন ব্যাপী সেই অবরোধ কাহিনী আর সেই অনুভূতি থেকেই বোঝা যায় কোন অভিজ্ঞতার মধ্যে সোভিয়েত সরকার, সোভিয়েত দেশের মানুষ যুদ্ধ-বিরোধী হয়েছে। কেন সোভিয়েত সরকার বিশ্বের যে-কোন প্রান্তে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠলে নিজে হস্তক্ষেপ করে সেই যুদ্ধের সম্ভাবনাকে বিদূরিত করে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টিতে আগ্রহী ? যুদ্ধের অভিজ্ঞতা, যুদ্ধের মর্মান্তিক পরিণতি সোভিয়েত দেশের মানুষ-যে মুল্য দিয়ে বুঝেছে ; তারা চায়না—পৃথিবীর কেউ আবার সেই মূল্য দিক। তাই বিশ্ব শান্তির আন্দোলনে সোভিয়েত সরকার ও সোভিয়েতের মানুষ সবচেয়ে অগ্রগামী।

লেনিনগ্রাদ দেখা শেষ হ'ল। লেনিনগ্রাদে এসে আমরা ভিড় ঠেলে বাসে উঠেছি, ট্রামে, ট্রলি-বাসে, মেট্রো-রেলে। লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছি ট্যাক্সির জন্যে। অফিস ছুটির সময় অর্থাৎ ছ'টা নাগাদ লক্ষ্য করেছি—এই সময়টা লেনিনগ্রাদের কেন্দ্রস্থলের সাথে কলকাতার ডালহৌসী-এসপ্লানেড এলাকার অবস্থার মধ্যে প্রায় সমতা ঘটে। একখানা বাসে আমি এবং আমার সহযাত্রী বন্ধু উঠলাম। কপালগুণে আমি বাসের মধ্যে ঠাঁই পেলাম, সহযাত্রী বন্ধু শঙ্কর ঘোষকে প্রায় ঝুলতে হ'ল হাতল ধরে। অফিস ফেরতা যাত্রীদের ভীড়ের চাপে আমরা অনুভব করলাম, এই একটি সময়ে ও ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ কলকাতা আর লেনিনগ্রাদ এক হয়ে যায়।

ট্যাক্সি সংগ্রহের অভিজ্ঞতাতেও কলকাতার সঙ্গে লেনিনগ্রাদের কিছুটা মিল আছে। লেনিনগ্রাদ থেকে রাত আড়াইটে নাগাদ আমাদের বিমান ছাড়বে। তাই রাত দশটা নাগাদই হোটেল থেকে বেরুতে হ'ল। বেশী রাত্তির হলে ট্যাক্সি পেতে বেশী অসুবিধা হবে। কিন্তু সকাল সকাল নেমেও অসুবিধার হাত থেকে রেহাই পেলাম না। ট্যাক্সির জন্যে ঘণ্টা দেড়েক দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ল। অবশ্য সেই নভেম্বর মাসের লেনিনগ্রাদ শহরের যে আবহাওয়া অর্থাৎ শীত ও বরফ-বৃষ্টি, তার এক শতাংশ কলকাতায় হ'লে বেলা দশটায় কলকাতার রাস্তা জনশূন্য হওয়া অসম্ভব নয়। হোটেল থেকে বিমানবন্দরের দূরত্ব মাইল ষোল হবে। এই ষোল মাইল রাস্তা রাত বারোটায় শহরের মধ্যে দিয়ে যেতেও দেখলাম শহরের কর্মচাঞ্চল্য তখনও শেষ হয়নি লেনিনগ্রাদ শহরে। রাত একটা নাগাদ আমরা লেনিনগ্রাদ বিমান বন্দর থেকে বিমানে উঠলাম। যাবো আর্মেনিয়া রাজ্যের রাজধানী ইয়েরেভান-এ। হাতের ম্যাপটা খুলে দেখলাম, কোথায় ইয়েরেভান। রাশিয়ার একপ্রান্তে হ'ল লেনিনগ্রাদ আর এক প্রান্তে হ'ল ইয়েরেভান। কৌতূহল বশতঃ দো-ভাষীর কাছে এই বিরাট দূরত্বের বিমান ভাড়া কত, জিজ্ঞাসা করলাম। দো-ভাষী বললেন, এই রুটটাই বোধ হয় রাশিয়ার সবচেয়ে বেশী ভাড়ার দূরত্বের পথ। লেনিনগ্রাদ থেকে ইয়েরেভান বিমান ভাড়া হলো ২৮ রুবল। কথাটা শুনে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিনি। যে-দেশে এক রুবল-এ ৪০ লিটার পেট্রোল, সেই দেশেই এমন ভাড়া সম্ভব।

বিমানের আসনে বসে শরীরের ওপর কম্বল টেনে দিলাম, কারণ ঘণ্টা ছয়েক নিশ্চিন্ত যাত্রা-পথে বিমান আর কোথাও থামবে না, থামবে একেবারে সকালে ইয়েরেভান-এ। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না, হঠাৎ ঘুম ভাঙলো বিমান-বালার কণ্ঠস্বরে। তাকিয়ে

দেখি সব যাত্রীই বেশ একটু উশ-খুশ করছেন। দো-ভাষী বললেন, "না, আমাদের বিমান পথে একটা বিমান বন্দরে নামছে; সম্ভবত আবহাওয়া খারাপ।" বিমান নামলো তুরস্ক-ইরাণ সীমান্তে দক্ষিণ ককেসাসের মিনেরাল নিয়েভ্দি বিমান বন্দরে। বিমান বন্দরে আমাদের নিয়ে যাওয়া হ'ল অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে। সামান্য সময় যাত্রা বিরতি, আহার, জলযোগের কোনও ত্রুটিই হ'ল না। বিমান বন্দরটি মস্কো, লেনিনগ্রাদের তুলনায় খুবই ছোট, তবে এই ছোট বিমান বন্দরেও বিমান নামছে-উঠছে বিরতিহীন ভাবে। লেনিনগ্রাদ বিমান বন্দরে বেশ কিছু বইয়ের আলমারি দেখেছিলাম, যে-আলমারিগুলিতে ঠাসা বই রয়েছে। আলমারির গায়ে লেখা আছে বিভিন্ন ভাষায় একটি করে লাইন "You May Take It" —এই হ'ল যার ইংরেজী তর্জমা। লেনিনগ্রাদ বিমান বন্দরে এই "You May Take It" দেখেও এর তাৎপর্য বুঝতে পারি নি। বুঝলাম নিয়েভ্দি বিমান বন্দরে এসে। এখানেও দেখলাম একই রকমের বইয়ের আলমারি এবং বই সাজানো রয়েছে এবং লেখা রয়েছে সেই "You May Take It" কথাটি। তারপর যখন দেখলাম, আমাদেরই মতো দু'জন বিমানযাত্রী আলমারি থেকে খান চারেক বই তুলে নিয়ে চলে গেলেন, তখন দো-ভাষীকে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, আপনাদের মতো যাত্রীদের নেবার জন্যেই রাখা আছে। যে-কেউ খুশী—এখান থেকে তাঁর পছন্দ মতো বই নিয়ে যেতে পারেন। সরকার বিনামূল্যে বিতরণের জন্যে, সেই সঙ্গে যাত্রীদের সময় কাটানোর সঙ্গী হিসেবে দেবার জন্যে, এই বইগুলি রেখেছেন। সারা রাশিয়ার সব বিমানবন্দরে, এমনকি রেলওয়ে স্টেশনেও এমনিভাবে বই রাখা আছে। দোভাষীর কথায় উৎসাহিত হয়ে বইয়ের আলমারীর কাছে গেলাম। দেখলাম সেখানে শুধু উন্নয়ন বিষয়ক নয়, জ্ঞান আহরণের সবক্ষেত্রের বই-ই

রয়েছে। ছোটগল্প, উপন্যাস, এমনকি নাটকের বই পর্যন্ত। রুশীয় সব ভাষার সঙ্গে ইংরেজী, ফরাসী, জার্মান ভাষারও বই রয়েছে। বিমান ছাড়লো প্রায় বেলা বারোটা নাগাদ। ককেসাস পর্বতমালা অতিক্রম করে ইয়েরেভান বিমান বন্দরে যখন বিমান নামলো, তখন মনে হলো বুঝি শিলিগুড়ির কাছে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামছি। আবহাওয়া, পরিবেশ—সবই ভারতীয় ধাঁচের। আমরা রাশিয়ার ইওরোপ খণ্ড ছেড়ে এশীয় খণ্ডে এসেছি, এটা স্থানীয় আবহাওয়াই আমাদের বুঝিয়ে দিল। বিমান বন্দর থেকে আমরা রওনা হলাম ইয়েরেভান-এর পথে। দূরত্ব মাইল আষ্টেক, দুপাশে আঙুরের বন, ছোট ছোট টিলা, প্রাচীন ধ্বংসস্তূপে খননকার্য চালিয়ে নতুন করে শহর পত্তনের দৃশ্য। আমাদের স্থান নির্দিষ্ট ছিল হোটেল আর্মেনিয়ায়। হোটেলের ঘরে ঢুকে জানলার পর্দাটা সরিয়ে দিলাম। সুউচ্চ হোটেলের জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম ইয়েরেভান শহরকে, তাকিয়ে দেখলাম সুপ্রাচীন আর্মেনিয়ার রাজধানী ইয়েরেভানকে; তাকিয়ে দেখলাম দূরে বাইবেলে বর্ণিত আরারাত পর্বতশ্রেণীকে। আমার টেবিলের ওপর আগে থেকে রেখে দেওয়া হয়েছে আর্মেনিয়া সংক্রান্ত বই, কাগজ, ছবি; সেই সঙ্গে রেখে দেওয়া হয়েছে সুন্দর একখানি ম্যাপ, রুশদেশ ও আর্মেনিয়া রাজ্যের। কফির কাপ হাতে নিয়ে ওলটাতে লাগলাম আর্মেনিয়া রাজ্যের ইতিহাস ও অগ্রগতির বইখানি।

১৯২০ সালের ২৯শে নভেম্বর গঠিত সোভিয়েত আর্মেনিয়া একটি ক্ষুদ্র দেশ হলেও প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং অন্যান্য বহু দিক থেকে যে-কোন বৃহৎ দেশগুলি অপেক্ষা বৈচিত্র্যপূর্ণ। বিভিন্ন পর্বতশ্রেণী এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে সমৃদ্ধ করেছে। এক একটি নতুন প্রাকৃতিক জগত সৃষ্টি করেছে। প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক

সম্পদ এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক পটভূমি আর্মেনিয়াকে এক অভূতপূর্ব ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। ট্রান্সককেসিয়ার দক্ষিণে এই আর্মেনিয়া সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিক অবস্থিত। অর্থাৎ এশিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের ককেসাসের সংযোগস্থলে এর অবস্থান। উত্তর এবং পূর্ব দিকে সোভিয়েত রিপাবলিকের জর্জিয়া ও আজারবাইজান সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিম এবং দক্ষিণ পূর্ব দিকে তুর্কী এবং ইরানের পুঁজিপতি রাষ্ট্রসমূহ।

যেহেতু আর্মেনিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি অংশ, তাই সারা দেশের সঙ্গে এর অর্থনৈতিক বন্ধন রয়েছে। শুধু তাই নয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মধ্য-পূর্ব বহুদেশের সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্যের সুযোগও এর রয়েছে। পারস্য উপসাগর এবং ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্তী যে সড়কটি ইউ. এস. এস. আর-এর সঙ্গে সংযোজিত, সেটিও আর্মেনিয়া ভূ-খণ্ডের ওপর দিয়ে গেছে। সোভিয়েত আর্মেনিয়া স্পেন, ইতালী এবং গ্রীসের মতো একই ভৌগোলিক অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত। প্রচণ্ড রৌদ্রকরোজ্জ্বল আবহাওয়া হচ্ছে আর্মেনিয়ার জলবায়ুর চরিত্রের একটি বিশেষ দিক। গ্রীষ্মকালে রিপাবলিকের উপত্যকাগুলি ট্রপিক্‌স-এর মতো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। যখন পর্বত চূড়াগুলি বরফাবৃত থাকে, তখন তাপাঙ্ক শূন্য ডিগ্রীরও নীচে নেমে যায়। আর্মেনিয়া কঠোরতা এবং প্রাকৃতিক বস্তুর কোমলতায় সংযোগ স্থাপন করেছে। গ্রীষ্মকালের গরম আবহাওয়া হচ্ছে এর কঠোরতা আর শীতকাল হচ্ছে এর শীতলতা বা কোমলতা। দেশটি অনুর্বর পর্বতমালায় আবৃত।

১৯২০ সালের ২৯শে নভেম্বর দাশনক সরকার এবং কৃষক-শ্রমিকদের দ্বারা আর্মেনিয়ান সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিক

প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ছিল পৃথিবীর মধ্যে পঞ্চম সার্বভৌম এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আর্মেনিয়ার শাসনতন্ত্রে ছিলো—ইচ্ছাকৃতভাবে তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধার্থে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও প্রতিরক্ষার ব্যাপারে যুক্ত থাকবে। ২৪, ৯৩, ০০০ জনসংখ্যা বিশিষ্ট এই দেশটি সোভিয়েত ইউনিয়নের যে-কোনও একটি রিপাবলিক অপেক্ষা ছোট। ২৯,৭৪০ বর্গ কিলোমিটার প্রশস্ত এই দেশটি আকৃতিগত দিক থেকে বেলজিয়াম অথবা আলবেনিয়ার মতো। আকৃতিতে ক্ষুদ্র হলেও সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আর্মেনিয়ার প্রভাব অপরিসীম। কৃষি এবং বাণিজ্যের বিরল দ্রব্য সামগ্রার ক্ষেত্রে আর্মেনিয়া অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এর মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রীসমূহ হ'ল মলিব্‌ডিনাম, তামা, সিন্‌থেটিক রবার, বিভিন্ন রকমের রেজিন ও ল্যাটেক্‌স, অটোমোবাইল, টায়ার, ক্যালসিয়াম কারবাইড এবং মেলামাইন, সালফিউরিক অ্যাসিড, অ্যাসিটেট সিল্ক, কৃত্রিম হীরক এবং বাণিজ্যিক প্রস্তরসমূহ, ভ্রাম্যমান বৈদ্যুতিক শক্তিপ্রকল্প, জেনারেটর, পাওয়ার ট্রান্‌সফরমার, বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, কমপিউটার, রেডিওর যন্ত্রপাতি, তাঁত এবং উলের সামগ্রী, ব্রাণ্ডি এবং আঙুরের মদ্যপানীয় ও অন্যান্য ফল ইত্যাদি। এ সমস্ত আর্মেনিয়া বিপ্লবের পর সম্ভব হয়েছে। শত শত আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত কলকারখানা স্থাপিত হয়েছে। কমপক্ষে দেড়শো রকমের উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী প্রায় সত্তরটি দেশে রপ্তানি করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের রিপাবলিকগুলির সঙ্গে আর্মেনিয়ার সম্পর্ক ক্রমশঃই সৌহার্দ্যপূর্ণ হচ্ছে। সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে আরও সফলতা অর্জন করবার জন্য আর্মেনিয়া তার প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে ক্রমেই ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক গড়ে তুলছে।

হোটেল আর্মেনিয়ার ব্যবস্থাসমূহ অন্য হোটেল থেকে একটু

স্বতন্ত্র। এখানে খাবার জায়গায় গিয়েই খেতে হয়। আর্মেনিয়া হোটেলে প্রথমদিনের অভিজ্ঞতাতেই আমরা যে এশিয়া খণ্ডে এসেছি তার স্বাদ পেলাম অর্থাৎ খাদ্যতালিকায় ভাত পাওয়া গেল। বেশ কয়েকদিন পরে শুধু ভাত নয়, একটা সুপ পেলাম, যার রান্না ভারতীয় ধাঁচের। ক'দিন থেকে দেখেছি ভাত অবশ্য সব সময় পাওয়া যায় না, কিন্তু এই সুপটা পাওয়া যেত বেলা দুটো থেকে ছ'টার মধ্যে। তাই যেখানেই থাকিনা কেন, ভাত আর এই সুপের লোভে দুপুরের খাওয়াটা কখনও মিস্ করিনি। হোটেল আর্মেনিয়াতে গান-বাজনার আসরটি ছিলো অন্য যে-কোন হোটেলের চেয়ে জমজমাট। গান-বাজনার আসরটি সাধারণত সন্ধ্যা থেকে শুরু হতো; কিন্তু এক এক দিন শেষ হতো রাত চারটের পর। গানের শিল্পীদের কণ্ঠও ছিল খুব আকর্ষণীয়। দু-একজন শিল্পীর গানের মধ্যে বেশ ভাটিয়ালী সুরেব আওয়াজ পেতাম। সত্যিকথা বলতে কি, অন্য হোটেলে এই গান-বাজনা আমার মনে বিরক্তি ছাড়া অন্য কোনও অনুভূতির সৃষ্টি করেনি। কিন্তু আর্মেনিয়া হোটেলের গান বেশ মনোযোগ দিয়েই শুনতাম। ইয়েরেভান শহরে মানুষের চেহারা এতো সুন্দর যে, অবাক হয়ে চেয়ে থাকতে হয়। বিশেষ করে রাশিয়ার মেয়েদের পৃথুল চেহারার তুলনায় আর্মেনীয় মহিলাদের চেহারার আকাশ-পাতাল প্রভেদ। মূলতঃ ইরান ও তুরস্কের বেশ প্রভাব আর্মেনিয়ানদের চেহারার মধ্যে আছে। সুন্দরকে সুন্দর বলায় আপত্তি নেই; তাই একজনকে কথা প্রসঙ্গে বলেই ফেলেছিলাম। জবাব পেয়েছিলাম খুব সুন্দর। বলেছিল, "জানতো, মোগল দরবারে আর্মেনীয় সুন্দরীদের কদর ছিল সবচেয়ে বেশী আর যার সমাধির পরে তাজমহল গড়ে উঠেছে, সেই মমতাজের দেহে ছিল আর্মেনীয় রক্ত।" ভারত-চর্চা রাশিয়ার সর্বত্র আছে। লেনিনগ্রাদ তো ভারত-চর্চার একটা পীঠস্থান বলা

যায়। কিন্তু আর্মেনীয়রা মনে করে, ভারতের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এতো ঘনিষ্ঠ যে, এই ঘনিষ্ঠতার দাবি অন্য কেউ করতে পারে না। বহু শত বৎসর আগে থেকে আর্মেনীয়দের ভারতে যাতায়াত—সেই যাতায়াতের গতি এখনও অব্যাহত। একজন পত্রিকা সম্পাদক আমায় গর্ব করে বলেছিলেন, কলকাতায় আর্মেনীয়রাই প্রথম গীর্জা তৈরি করেছিল আর বোকারো তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের চীফ এঞ্জিনিয়ার হলেন একজন আর্মেনীয়ান। যাক, এবার ইয়েরেভান-এর কথায় আসা যাক।

ইয়েরেভান হল আর্মেনিয়ার রাজধানী। খ্রীষ্টপূর্ব ৬০৭ সালে কিছু লিখিত নথিপত্রে ইয়েরেভানের নামের উল্লেখ দেখা যায়। ইয়েরেভান হচ্ছে রোমের মতো পৃথিবীর একটি প্রাচীনতম শহর। ১৬শ' শতাব্দীর শুরুতেই ইয়েরেভান দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ—পার্সিয়া এবং অটোম্যান তুর্কীর মাঝখানে শহর হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে তার সেনাবাহিনী সহ। ১৭৩৫ সালে পার্সিয়ার অঙ্গ হিসাবে ইয়েরেভান খানশাহীর কেন্দ্রে পরিণত হয়। বিপ্লবের পর থেকে ইয়েরেভান হয় একটি বৃহৎ বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক এবং বৈজ্ঞানিক কেন্দ্র স্বরূপ। ইয়েরেভানস্থিত অধিকাংশ শিল্প সংস্থাগুলি বিপ্লবের পর গড়ে উঠেছে। বিখ্যাত শিল্প সংস্থাগুলির মধ্যে ব্র্যাণ্ডি ডিস্টিলারী, আরারাত ট্রাস্ট, মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং, ১৯৬৬ সালে নির্মিত মোটর তৈরির কারখানা—ইয়েরাজ মোটর ওয়ার্কস; কেমিক্যাল ইনডাস্ট্রিজ, গ্যাস ও টায়ার ফ্যাক্টরি, ভারী শিল্পের মধ্যে অ্যালুমিনিয়াম কারখানা, লৌহ-ইস্পাত কারখানা, আরারাত কারখানায় উৎপাদিত সিমেন্ট ইত্যাদি, মার্বেল-ওয়ার্কিং ফ্যাক্টরি প্রভৃতি শিল্প সংস্থাগুলিতে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী যে শুধুমাত্র ইয়েরেভানের নির্মাণ কাজেই লাগে, তাই নয়, মস্কো, লেনিনগ্রাদ, তবিলিসি, বাকু এবং অন্যান্য স্থানেও এর প্রচুর চাহিদা রয়েছে।

এখানকার তৈরী মার্বেল মস্কোর প্যালেস অব কংগ্রেস, বেশ কয়েকটি স্টেশন, লেনিনগ্রাদের ভূগর্ভস্থ কিছু কাজ এবং মস্কোস্থিত সোভিয়েত আর্মির মিউজিয়াম নির্মাণের কাজে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। বিপ্লবের পূর্বে ইয়েরেভানে-এ লোকসংখ্যা ছিল ২০ হাজার ; বর্তমানে সেই সংখ্যা ৮ লক্ষ।

ইয়েরেভানকে মনে হয় আরারাত উপত্যকার একটি প্রয়োজনীয় অংশ, যা বৃহৎ আরারাত এবং ক্ষুদ্র আরারাতের মাঝে মুকুটের মতো শোভা পাচ্ছে। অ্যাকাডেমিশিয়ান আলেকজাণ্ডার তামানিয়ান কর্তৃক অঙ্কিত পরিকল্পনার ওপরই আধুনিক ইয়েরেভান নির্ভরশীল। ইয়েরেভানের শৈল্পিক নিদর্শনের মধ্যে দক্ষিণ দিকের রেলওয়ে টার্মিনালের দিকে অবস্থিত অক্টোবর অ্যাভিন্যু, শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত লেনিন স্কোয়ার, অপেরা থিয়েটার এবং কানাকার প্লাটো প্রভৃতি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। শহরের কেন্দ্রের অংশটি বিভিন্ন রাস্তা, পার্ক এবং বাগান দ্বারা পরিবেষ্টিত। শহরের অন্যান্য স্থাপত্যশিল্প কাজের মধ্যে আখতানক ব্রীজ, প্রধান রাজদান ব্রীজ, সেনট্রাল মার্কেট, অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের বিল্‌ডিংসমূহ, আর্মেনিয়ান কম্যুনিস্ট পার্টির সেনট্রাল কমিটি বিল্‌ডিং এবং রেলওয়ে টারমিনাল, কৃত্রিম লেক, রুফ্‌ড মার্কেট প্রভৃতি প্রধান। এছাড়াও সর্বাপেক্ষা বড় এবং ব্যয়বহুল মিউজিয়াম, লাইব্রেরি, স্থায়ী প্রদর্শনী—যেগুলি পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত, তার অনেকগুলিই ইয়েরেভানে অবস্থিত। ম্যাটেনাডারান, পৃথিবীর প্রাচীন ম্যানস্ক্রিপ্টের একটি সুন্দরতম রিপোজিটরী, যা ইয়েরেভান তথা সমগ্র আর্মেনিয়ান সংস্কৃতির গর্বস্বরূপ। ১৫,০০০ শিল্পকর্মসমন্বিত স্টেট হিস্টোরিক্যাল মিউজিয়ামটি সুন্দর স্তম্ভ দ্বারা শোভিত। ইয়েরেভানের অন্যান্য মিউজিয়াম—মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্টরী এবং মিউজিয়াম অব দি হিস্টরীও কম আকর্ষক নয়। ইয়েরেভানে উচ্চ শিক্ষার জন্য ১১টি বিদ্যালয় এবং

৬০টির মতো বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ তৎসহ প্রায় ৪০টি রিসার্চ ইনষ্টিটিউট ও তাদের শাখাগুলি এবং ইউনিভারসিটি ও সেকেণ্ডারী স্কুলসমূহ রয়েছে, প্রতিবছর যেখান থেকে বেশ কিছু সংখ্যক দক্ষ যুবসম্প্রদায় জাতীয় অর্থনীতি এবং কৃষ্টিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। ইয়েরেভানের সানদাকিয়ান থিয়েটারের ঝুলন্ত কাফে আর একটি দর্শনীয় জিনিস।

আর্মেনিয়ার প্রধান গীর্জাটি হচ্ছে ৭ম শতাব্দীতে নির্মিত একমিয়াজিনের "গায়েন্ টেম্পল"। অপর একটি আকর্ষণীয় জিনিস হ'ল আপ-রাইজিং স্কোয়ারের "লেলিনাকন"। আখুরায়ান নদীর বাম তীরের বিশাল সমতল ভূমিতটে এটির অবস্থান। আর্মেনিয়ার অপর একটি মনোরম জায়গা হ'ল কিরোভাকান-এর লেনিন অ্যাভেন্যু। ছুটি কাটাবার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট জায়গা হচ্ছে এটি। ভ্যানাজোর নদীর ধারে সুন্দর ছায়া সুনিবিড় পার্কের মধ্যে আর্মেনিয়ান স্যানাটোরিয়ামটি অবস্থিত। এই শহরের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে শহরের দক্ষিণদিকে ভ্যানাজোর নদীর তীরবর্তী সুন্দর বাগানগুলি। এই বাগানগুলিতে বিভিন্ন দেশের প্রায় ৬০০ রকমের সুন্দর গাছ রয়েছে। আর্মেনিয়ার জাঙ্গেজুর-এর "রিং-মাউণ্টেন," "স্টোন-ফরেস্ট" বা "পিরামিড", জল, আলো, বাতাস দ্বারা সৃষ্ট এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। সোভিয়েত শক্তি জাঙ্গেজুরের কতকগুলি সম্পদের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। এইভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বুকে ধীরে ধীরে নানা প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য এবং সম্পদশালী হয়ে গড়ে উঠেছে সোভিয়েত আর্মেনিয়ান রিপাবলিকের রাজধানী ইয়েরেভান।

আমরা দেখে এলাম সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান নির্মাতা লেনিনের বিশ্বস্ত সহকারী মিকোয়ানের জন্মভূমি। মিকো-য়ানের জন্মস্থান দেখতে যাবার পথেই পড়লো, বিজয় সেতু, যে

সেতু দিয়ে লালফৌজ ইয়েরেভানে প্রবেশ করেছিল। বিজয় সেতুর আগেই বাঁদিকে পড়লো সেই বিখ্যাত কোনিয়াক কারখানা, যে কারখানাতে একদা ম্যাক্সিম গোর্কি এসেছিলেন। মিকোয়ান মিউজিয়ামে এসমাজান গীর্জায় প্রায় পুরো একটা দিন কাটিয়ে আমরা দেখতে গেলাম ভেড়া বিক্রির হাট। ফাঁকা একটা মাঠের মতো জায়গায় হাজার হাজার ভেড়া নিয়ে এসেছে বিক্রেতারা; বহুদূরের গ্রামের মানুষরা এই ভেড়া বিক্রেতা। অনেকের পোশাক কাবুলী ধাঁচের।

১৬ই এবং ১৭ই নভেম্বর দুদিন আমরা একাধিক সাংবাদিক এবং অন্যান্যস্থানের বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মিলিত হলাম। সোভিয়েত আর্মেনীয় পত্রিকার সম্পাদক লরিস ক্লোরিয়ান, যিনি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সেনট্রাল কমিটির সদস্য—তাঁর কাছে বেশ কিছু নতুন কথা শুনলাম। মিঃ ক্লোরিয়ান বললেন, কাজের মানুষের অভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সঙ্গে একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে—বিশেষতঃ আর্মেনীয় অঞ্চলে, সেটা হ'ল সাদা পোশাকের চাকরির প্রতি আগ্রহ। সোভিয়েত আইন অনুযায়ী শিক্ষা শেষে কারও দেড় বছরের বেশী বসে থাকা চলবেনা। কিন্তু বেশ কিছু সাদা পোশাকের চাকরিতে আগ্রহী যুবক-যুবতী নানা আছিলায় বেশীদিন বসে থাকবার চেষ্টা করছে। ফলে, কলকারখানায় কাজে আগ্রহ সৃষ্টির জন্যে খবরের কাগজে নিবন্ধ লিখতে হচ্ছে। করণিক জাতীয় কাজে লোকের অভাব সবচেয়ে বেশী। যুবকেরা ঝাড়ুদার হতে চায়; কিন্তু কেরাণী হতে রাজী নয়।

সোভিয়েত আর্মেনিয়ার সম্পাদক জানালেন, এই পত্রিকার প্রতিষ্ঠা ১৯২০ সালে। বর্তমানে এই পত্রিকা মন্ত্রিপরিষদ,

সুপ্রীম সোভিয়েত ও পার্টির মুখপাত্র হিসাবে কাজ করছে। পৃথিবীর যেসব দেশে আর্মেনিয়ানরা আছে, এই রকম ৩২টি দেশে এই পত্রিকা যায়। আর্মেনীয় ভাষায় রবীন্দ্রনাথের সমস্ত অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। রামায়ণ মহাভারত থেকে আরম্ভ করে সমস্ত রকম ধ্রুপদী সাহিত্যের অনুবাদ হয়েছে। শুধু আর্মেনিয়ায় নয়, ইতিমধ্যে যে সব দেশ ঘুরেছি ও পরে ঘুরলাম সর্বত্রই দেখেছি, সোভেয়েত ইউনিয়নে বিদেশী সাহিত্যের মধ্যে ভারতীয় সাহিত্যের প্রতি কদর ও আগ্রহ অন্য যে-কোন সাহিত্যের তুলনায় বেশী। রামায়ণ, মহাভারত এবং রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েত ইউনিয়নে যত রকম ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং যত রকমের সংস্করণ হয়েছে এবং বিক্রয়ের সংখ্যা যা, তা দেখে নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যায়, রবীন্দ্রনাথ এবং ভারতীয় ধ্রুপদী সাহিত্যের মাধ্যমে আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের সাংস্কৃতিক জীবন জয় না করলেও বিরাট প্রভাব ফেলতে পেরেছি। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নে যে চর্চা চলছে, সেটা দেখে রীতিমতো গর্ববোধ হয়। মস্কোর রাস্তায় চলতে একসময় একটা লালবাড়ি আমাদের দেখানো হ'ল। বিরাট লালবাড়িটি রক্ষিত রয়েছে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি হিসাবে। রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় এসে মস্কো অবস্থানকালে এই বাড়িতে বাস করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত ঘর, প্রতিটি দ্রব্যসম্ভার অবিকৃতভাবে রেখে দেওয়া হয়েছে। সেদিন রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় এসে যেসব স্থান পরিদর্শন করেছিলেন, সেসব স্থানেও রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি রক্ষিত হয়েছে। বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শন করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছি, প্রায় সর্বত্রই রবীন্দ্রনাথের ছবি আছে।

আর্মেনীয় সম্পাদকদের কাছে প্রশ্ন করেছিলাম, ভারতবর্ষ সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের মানুষের এই ভালবাসা ও শ্রদ্ধার মূল উৎসটা কি? যদি উৎস হয় রাজনৈতিক, তবে রামায়ণ-

মহাভারত থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-সুকান্ত পর্যন্ত সাহিত্যিকদের এতো প্রভাব রাশিয়ায় কেন? আর্মেনীয় সাংবাদিক সম্পাদক আমাদের সামনে কফির কাপ এগিয়ে দিয়ে একটু হেসেছিলেন, বলেছিলেন—"হাতে সময় আছে তো?" তিনি বললেন, "আপনারা আগেই খোঁজ করেছেন, সোলঝেনিৎসিন ও সাখারোভ সম্পর্কে, এখন খোঁজ করছেন, কেন রাশিয়ার মানুষ রামায়ণ-মহাভারত পড়ে, রবীন্দ্রনাথকে ভালোবাসে। সব কথার জবাব দিতে হলে বেশ সময় লাগবে।" সেই সময় আমরা দিয়েছিলাম। সাংবাদিক, সুপণ্ডিত লরিস ক্লোরিয়ান প্রথমে শুরু করলেন সাখারোভ-সোলঝেনিৎসিন প্রসঙ্গ নিয়ে। সাখারোভ-সোলঝেনিৎসিন সম্পর্কে তিনি যেসব কথা বলেছিলেন, তার উল্লেখ এখানে করছি না, পরে এ সম্পর্কে সারা রুশ দেশ ঘুরে যা দেখেছিলাম, যা বুঝেছিলাম ও শুনেছিলাম, সেকথা একসঙ্গে বলবো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ক্লোরিয়ান যেকথা বললেন, সেকথা শুনে অবাক না হয়ে পারলাম না। তিনি বললেন, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা ঋষি। তাই রুশ-বিপ্লবের আগেই তিনি বলতে পেরেছিলেন, "ইহার পর আরো একটা লড়াই সামনে রহিল, সে বৈশ্যে-শূদ্রে, মহাজনে-মজুরে। কিছুদিন হইতে তাহার আয়োজন চলিতেছে, সেইটা চুকিলেই মনুর পালা শেষ হইয়া নতুন মন্বন্তর পড়িবে।" ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লব হ'ল। রুশ সাম্রাজ্যে বৈশ্যে আর শূদ্রে লড়াইয়ে জয়ী হলেন লেনিন অর্থাৎ শূদ্র শ্রমজীবী মানুষের প্রতিনিধি। পৃথিবীর "স্থলভাগের ছ'ভাগের একভাগ ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হ'ল শূদ্রের রাজত্ব আর পৃথিবীর বিপুল অংশে শূদ্রের দল কেউ রাজত্ব করছে আর কেউ কায়েম করবার জন্যে লড়াই করছে। এরপর রবীন্দ্রনাথ স্বচক্ষে রাশিয়া দেখতে এলেন। স্বচক্ষে দেখলেন, শূদ্রের দল কেমন রাজত্ব চালাচ্ছে। রুশ বিপ্লবের

মাত্র কয়েক বৎসর পরে রাশিয়াকে দেখে রবীন্দ্রনাথ বললেন, "যারা মূক ছিল তারা ভাষা পেয়েছে, যারা মূঢ় ছিল তাদের চিত্তের আবরণ উদ্‌ঘাটিত, যারা অক্ষম ছিল তাদের আত্মশক্তি জাগরূক, যারা অবমাননার তলায় তলিয়ে ছিল আজ তারা সমাজের অন্ধ কুঠুরি থেকে বেরিয়ে এসে সবার সঙ্গে সমান আসন পাবার অধিকারী। এত প্রভূত লোকের যে এত দ্রুত এমন ভাবান্তর ঘটতে পারে তা কল্পনা করা কঠিন। এদের এত কালের মরা গাঙে শিক্ষার প্লাবন বয়েছে দেখে মন পুলকিত হয়। দেশের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত সচেষ্ট, সচেতন। এদের সামনে একটা নূতন আশার বীথিকা দিগন্ত পেরিয়ে অবারিত—সর্বত্র জীবনের বেগ পূর্ণ মাত্রায়। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে এখানে যে বিপ্লব হয়ে গেল তার আগে এদেশে শতকরা নিরানব্বই জন চাষী আধুনিক হলযন্ত্র চক্ষেও দেখেনি। তারা সেদিন আমাদেরই চাষীদের মতো সম্পূর্ণ দুর্বলরাম ছিল—নিরন্ন, নিঃসহায়, নির্বাক। আজ দেখতে দেখতে এদের খেতে হাজার হাজার হলযন্ত্র নেমেছে। আগে এরা ছিল যাকে আমাদের ভাষায় বলে কৃষ্ণের জীব—আজ তারা হয়েছে বলরামের দল।"

বুঝলাম রুশ সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথের "রাশিয়ার চিঠি" বইখানি কণ্ঠস্থ করে রেখেছেন। এরপর তিনি আরো তথ্য উদ্ধৃতি দিয়ে বোঝালেন, কেন রবীন্দ্রনাথ এবং ভারতীয় সাহিত্য রুশদেশে জনপ্রিয় ও কালজয়ী হয়েছে। লরিস ক্লোরিয়ান আরো অবাক করে দিলেন, যখন তিনি আর্মেনীয়দের সঙ্গে কলকাতার সম্পর্ক-বিষয়ে বলছিলেন। কথাটা উঠেছিল এই নিয়ে, বেশ কিছু আর্মেনীয় নাকি রুশদেশ ছেড়ে যাচ্ছে, বিশেষ করে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর। রুশ সাংবাদিক হিসেব করে দেখালেন সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবার পর যুদ্ধের আগে প্রায় একলক্ষ আর্মেনীয় স্বদেশে ফিরে এসেছে, যুদ্ধের পরে এসেছে দু'লক্ষ। কিছু-

লোক ইহুদী রাষ্ট্র কায়েম হয়েছে—এই মনোভাব নিয়ে চলে গেয়েছিল ঠিকই, তবে তারা অনেকেই আশাভঙ্গ হয়ে ফিরে এসেছে। এর পরে কথা উঠলো কলকাতার সঙ্গে আর্মেনীয়দের সম্পর্ক নিয়ে। অবাক হয়ে শুনছিলাম কলকাতায় আর্মেনীয়দের ইতিহাস। বিস্মিত হয়ে ভাবছিলাম, কলকাতার অলি-গলি নিয়েও এরা কতো খোঁজ খবর রাখেন। কলকাতায় আর্মেনীয়দের ইতিহাস সত্যিই খুবই চমকপ্রদ। শুধু এই সাংবাদিক নন, অন্য অনেকের কাছে কলকাতায় আর্মেনীয়দের সম্পর্কে ইতিহাস শুনেছি। আর্মেনীয়-বাসীদের কাছে কলকাতা একটা পীঠস্থান বিশেষ। মনোজগতে কলকাতা হলো আর্মেনীয়দের দ্বিতীয় রাজধানী। কলকাতা সম্পর্কে আর্মেনীয়রা যেসব ইতিহাস সংগ্রহ করেছেন, তা হ'ল নিম্নরূপ :

জব চার্নকের অন্তত ৬৫ বছর আগে ভাগীরথী তীরে আর্মেনীয়-দের বাণিজ্যপোত নোঙর ফেলেছিল। জব চার্নক তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে কলকাতার মাটিতে নামেন ১৬৯৫ সালে। আর্মেনীয়ান চার্চ হচ্ছে কলকাতার প্রথম খ্রীষ্টধর্মের পীঠস্থান এবং স্বর্গত দানী সুকিয়াসের স্ত্রী 'রেজাবিবে'ই হলেন প্রথম সেই খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ব্যক্তি, ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুলাই যিনি স্বর্গারোহণ করেন এবং কলকাতার মাটিতে অর্থাৎ ২নং আর্মেনিয়ান স্ট্রীটের "আর্মেনিয়ান চার্চ"এর সমাধিভূমিতে যাঁকে সর্বপ্রথম কবর দেওয়া হয়। অবশ্য কলকাতার আগে আর্মেনিয়ানরা চুঁচড়ায় একটি চার্চ তৈরি করেন এবং বসবাস করতে শুরু করেন চন্দননগরে। চুঁচড়া থেকে জাতব্যবসায়ী আর্মেনিয়ানদের কলকাতায় আসবার প্রধান কারণ হ'ল, সুতানুটীর মসলিনের প্রতি তাদের তীব্র আকর্ষণ এবং আরব-

রাজ্যগুলিতে সেই মসলিনের ব্যাপক চাহিদার প্রলোভন। হাওড়া ব্রীজ-এর কিছুটা দক্ষিণে, যেখানে আর্মেনীয়দের নৌকা ভিড়েছিল, সেটিই এখন আর্মেনিয়ান ঘাট। ব্যবসার বিশেষ সুবিধা এবং নির্জন নদী সৈকতের অপূর্ব সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের অন্যান্য স্থানের আর্মেনিয়ানরা কলকাতায় এসে ধীরে ধীরে গড়ে তোলেন "আর্মানিটোলা"। যদিও লিখিত কোনও স্বীকৃতি নেই, কিন্তু বর্তমান নিউ হাওড়া ব্রীজ, অ্যাপ্রোচ রোড ও ব্রেবোর্ণ রোডের কিছু অংশ, ওল্ড চায়না বাজার এবং আর্মেনিয়ান স্ট্রীটের চারিদিকের বেশ কিছুটা স্থান জুড়ে একদিন জমজমাট হয়ে উঠেছিল আর্মানি-টোলা ; আজ আর শ্বেতাঙ্গ আর্মেনিয়ানদের ব্যবসার মাল-বোঝাই নৌকা আর্মেনিয়ান ঘাটে ভীড়ে না অথবা আর্মেনিয়ানদের বিশ্বখ্যাত ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দও আর্মানিটোলার রাস্তায় এখন আর শোনা যায় না। তবে এখনও প্রতি রবিবার কলকাতার আর্মেনিয়ান পুরুষ-মহিলা ও তরুণ-তরুণীরা আর্মানিটোলার চার্চের উঠোনে সমবেত হন। উত্তর পুরুষের সেই সম্মিলিত প্রার্থনার শব্দে সচকিত হয়ে ওঠে "রেজাবিবে"র কবর এবং তারও পূর্বে—আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পূর্বে আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, ঔরঙ্গ-জেবের সময় পর্যন্ত—যেসব আর্মেনিয়ানরা ভারতে এসেছিলেন, বেঁচে ওঠে তাঁদের আত্মাও। আকবরের খ্রীষ্টান-পত্নী মারিয়াম জামানি বেগমও নাকি আর্মেনিয়ান ছিলেন। কেউ কেউ মনে করেন, মীরকাশেমের সেনাপতি গুরগন্ খাঁও আর্মেনিয়াম বংশোদ্ভূত ছিলেন।

একদিন যাঁরা জব চার্নকের কলকাতায় নিজেদের সম্প্রদায়কে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন; আজ সেখানে অতীতের স্বাক্ষর হিসাবে শুধু পড়ে আছে একটি চার্চ, একটি ভজনালয়, একটি রাস্তা, একটি

ক্রীড়াসংঘ, একটি বিদ্যালয়, সাংস্কৃতিক সমিতি এবং ইতস্ততঃ আরো কিছু স্মৃতি। এক সময় কলকাতার বড় বড় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলি ছিল এঁদেরই প্রতিষ্ঠিত। এর পূর্বে ঢাকায়, মুর্শিদাবাদে, রাজমহলে এবং পলাশীতে আর্মেনিয়ানদের কুঠি ছিল, তখন বাংলাদেশের বস্ত্র, পাট ও অন্যান্য বড় বড় ব্যবসাগুলির চাবিকাঠিও ছিল আর্মেনিয়ানদের হাতে। পর্তুগীজ পাদ্রীদের আগেও আর্মেনিয়ানরা এদেশে এসে চার্চ নির্মাণ করেন। যদিও বর্তমান ২নং আর্মেনিয়ান স্ট্রীটের চার্চ বাড়িটি ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত কিন্তু এখানে ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দের মৃত ব্যক্তির কবরের সন্ধান পাওয়া গেছে। চার্চ প্রাঙ্গণের কবরগুলির অধিকাংশ শিলালিপিই আর্মেনিয়ান ভাষায় লেখা। আর্মেনিয়ানরা মূলতঃ তিনটি ধর্মকেন্দ্রিক সম্প্রদায়ে বিভক্ত—খ্রীষ্টান, মুসলমান এবং অরথোডক্স। কলকাতার আর্মে-নিয়ান চার্চ গোঁড়া ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা পরিচালিত। প্রথম যুগের কাঠের নির্মিত চার্চটি অকস্মাৎ আগুনে ভস্মীভূত হওয়ায় বর্তমান ভবনটি নির্মিত হয় এবং পূর্বের সেন্ট জনস্ চার্চ থেকে এর নতুন নামকরণ হয়—আঘানাজের নামে এক ভদ্রলোকের নামানু-সারে "নাজারেথ চার্চ"। ১৭৩৪ সালে চার্চটির পুনঃসংস্কার করা হয়। ইরানের জুলফা চার্চের ধর্মীয় আইন কর্তৃক কলকাতার আর্মেনিয়ান চার্চ অনুশাসিত।

আচার্য জগদীশ বসু রোডের জর্জিস চ্যাপেলটিও কলকাতার আর্মেনিয়ান সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এর কাছেই ১৯৫৫ সালে স্থানীয় আর্মেনিয়ানরা তৈরি করেন "সার পল চার্টার হোম" নামক অনাথ আশ্রমটি। যদিও আমরা জানি, ডেভিড হেয়ার এদেশে প্রথম ইংরেজী ভাষার পঠন-পাঠন প্রচলন করেন, কিন্তু কলকাতার অ্যানি বাজিল প্রভৃতি আর্মেনিয়ান বিদুষীরা তাঁদের বিভিন্ন গ্রন্থে

উল্লেখ করেছেন যে, ডেভিড হেয়ারের আগেও এদেশে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম পথিকৃৎ হলেন একজন আর্মেনিয়ান ভদ্রলোক। ১৭৯৮ সালে কলকাতায় প্রথম বেসরকারী ভাবে গড়ে ওঠে আর্মেনিয়ান কলেজ—যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আরাতুন কালোস্ নামে এক ভদ্রলোক। এখনও ৫৬বি, ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে আর্মেনিয়ানদের একটি বেসরকারী কলেজ চলছে। হোটেলের ব্যবসায়ে আর্মেনিয়ানদের সর্বভারতীয় খ্যাতি ছিল। কলকাতার বিখ্যাত গ্র্যাণ্ড হোটেল আর্মেনিয়ানদেরই প্রতিষ্ঠিত। গড়ের মাঠে আর্মেনিয়ান স্পোর্টস ক্লাবের যে তাঁবু রয়েছে, তার প্রতিষ্ঠা ১৯৪৭ সালে হলেও কলকাতায় আর্মেনিয়ানদের "ক্রীড়াসংঘ" গঠিত হয় ১৮৮০ সালের গোড়ায়। হকি খেলোয়াড় তৈরীতে একদা এই সংঘের যে খ্যাতি ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলার একদা বিখ্যাত হকি খেলোয়াড় বুলবুল, যাঁর প্রকৃত নাম জাভেন কারানিয়েট, যিনি জাতে আর্মেনিয়ান ছিলেন—তাঁর ক্রীড়া-কৌশলের কথা জেনে। ১৯৬৮ সালে বাংলার হকিসভার সম্পাদক ছিলেন আর্মেনিয়ান এক ভদ্রলোক—জে. ডি. আরাতুন।

এরপর আসে কলকাতার আর্মেনিয়ানদের উৎসবের প্রসঙ্গ। খ্রীষ্টান ধর্মের লোক হিসাবে তাঁরা শুভ শুক্রবার, বড়দিন, ইস্টার উৎসব—ইত্যাদি সবই পালন করে থাকেন। এছাড়াও আছে আর্মেনিয়ানদের নিজস্ব জাতীয় উৎসব। এর মধ্যে "ফিস্ট্ অব এফিনি", "ভারতাবার", "তোরেন ফেস" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৭৭২ সালে মাদ্রাজে আর্মেনিয়ানদের প্রথম ছাপাখানা চালু হয়। ১৭৯৭ সালে কলকাতায় তাঁদের ছাপাখানা খোলা হয়। মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থটির নাম "খ্রীষ্টান ধর্মের সত্য"। ভারতে আর্মেনিয়ানরা মাদ্রাজ থেকে প্রথম "আজদারার" সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

১৮২০ সালে রাজা রামমোহনের যুগে কলকাতা থেকে তাঁদের প্রথম সাময়িক পত্রিকা "মিরর" বের হয়। থমাট খোজামল নামে একজন আর্মেনিয়ান ব্যবসায়ী "বাংলার ইতিহাস" নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তাঁর রচনার উৎস ছিল মূলতঃ পার্সিয়ান ও আর্মে-নিয়ান পণ্ডিতদের রচনাদি।

ভারতে বসবাসকারী আর্মেনিয়ানদের মধ্যে জোসেফ এমিন, শাহামির, শাহামিরিয়ান, বাঘরামিয়ান প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এঁরা ভারতে থেকে অষ্টাদশ শতকে আর্মেনিয়ার মুক্তি আন্দোলনের পক্ষে প্রচার চালিয়ে যান। ১৭৭৩ সালে জোসেফ এমিন মাদ্রাজে গিয়ে সেখানে বিখ্যাত আর্মেনিয়ান বণিক—শাহামিরিয়ানের সঙ্গে একযোগে একটি রাজনৈতিক চক্র গড়ে তোলেন। এই চক্রের উদ্দেশ্য ছিল আর্মেনিয়ার স্বাধীনতার জন্য প্রচার। এঁদেরই উদ্‌যোগে মাদ্রাজে একটি ছাপাখানা তৈরী হয় এবং এই ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পুস্তিকার মারফত আর্মেনিয়ানদের স্বাধীনতার পক্ষে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করা হয়।

জোসেফ এমিন, শাহামিরিয়ান, বাঘরামিয়ান ও শাহামির-এর আর্মেনিয়া আজ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক জাতিসংঘের অন্যতম একটি প্রজাতন্ত্র। অক্টোবর বিপ্লবের পর ১৯২২ সালে আর্মেনিয়া সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হয়।

১৭ই নভেম্বর। বেলা পাঁচটা বাজে। একখানা বই কিনবার উদ্দেশ্যে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। লেনিন স্কোয়ারে আগেই বড় বড় বইয়ের দোকান দেখেছি, তাই বেরিয়ে পড়লাম বইয়ের দোকানের মহল্লার দিকে। পরপর বেশ কয়েকটা বড় দোকান ঘুরলাম।

দোকানগুলিতে হাজার হাজার বই সাজানো। কিন্তু আমরা যে বইটি খুঁজছি, তার কোনও ইংরেজী সংস্করণ নেই। সঙ্গে দোভাষী নেই; দোকানে মহিলাকে বইয়ের নাম আর "ইংলিশ ইংলিশ" বলে আমরা কি চাই, বোঝাবার চেষ্টা করছিলাম। হঠাৎ পাশে দাঁড়ানো তুটি মেয়ে, তার একজন এগিয়ে এলো। সুন্দর ইংরেজীতে বললো, "তোমরা কি খুঁজছো, আমায় ইংরজেীতে বলো, আমি ইংরেজী জানি। আমার নাম অ্যানিস।" আমরা আমাদের নাম বলে আমাদের প্রয়োজনীয় কথা অ্যানিসকে বললাম। অ্যানিস আর তার বান্ধবী তুজনেই আমাদের সাথে পরিচয় বিনিময় করে বললো, "চলো আমাদের সঙ্গে, আমরা তোমাদের বইয়ের দোকান দেখিয়ে দিচ্ছি। অ্যানিস আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে হাঁটতে শুরু করলো। দ্বিতীয় মেয়েটি শঙ্করবাবুর সঙ্গে খুব হাত নেড়ে গল্প করছে। অনেক কথার পরে জানা গেল, অ্যানিস ইনস্টিটিউট-এ পড়ে। ইনস্টিটিউট থেকে পালিয়ে একখানা আমেরিকান ফিল্ম দেখতে গিয়েছিল। অ্যানিস দেখলাম রাজকাপুর-রীতাকে চেনে, সেই সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধী, পণ্ডিত নেহরু ও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল। ইন্দিরা গান্ধীকে টেলিভিশনের পর্দায় দেখেছে এবং দেখে তার মনে হয়েছে, শ্রীমতী গান্ধীর মতো দেখতে সুন্দরী অন্য কাউকে সে দেখেনি। তার প্রশ্ন—এতো নরম চেহারা, সুন্দরী দেখতে যে মহিলা, তার পক্ষে কি দেশ শাসন প্রশাসন চালানো সম্ভব? আমি যখন শ্রীমতী গান্ধীর দৃঢ়তা, বিশেষ করে বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধে শ্রীমতী গান্ধীর ভূমিকা সম্পর্কে বললাম, তখন অ্যানিস বললো, "তাহলে আমি একজন মহিলা হিসাবে নিশ্চয়ই গর্ব বোধ করি, কারণ একজন মহিলা ভারতবর্ষকে পরিচালনা করছেন।" বইয়ের দোকানে পৌঁছে দোকানদারের সঙ্গে যা কথা বলবার অ্যানিসই বললো, তারপর প্যাকেট বাঁধা

বইখানি আমার হাতে তুলে দিল অ্যানিস। আমি ব্যাগ থেকে দাম দিতে যেতেই অ্যানিস চোখ পাকিয়ে বললো, "খবরদার, তোমার আরো যদি কিছু বইয়ের দরকার থাকে নিয়ে নাও ; দামের কথা ভাবতে হবেনা।" আমি বললাম, "সে কি ? তুমি আমার বইয়ের দাম দেবে কেন ?" অ্যানিস বললো, "দেবো এই কারণে, তুমি আমার দেশের অতিথি, ছুনম্বর—তুমি এমন একটা দেশের লোক, যে-দেশের লোক, যে-দেশের মানুষ একজন মহিলাকে প্রধান-মন্ত্রী করেছে।" আমি আর কথা বাড়াবার চেষ্টা করিনি। আরো ছু-একখানা বই দেখবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সেদিকেও তাকাইনি। কারণ আমি বই কিনতে গেলেই আবার অ্যানিসের ধমকে পড়তে হ'ত। দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম। রাস্তায় বের হতেই অ্যানিসের আবদার—"চলো দোকানে, কি খাবে বলো ?" খাওয়ার কথা চাপা দিয়ে বললাম, তার চেয়ে চলো, তোমাদের বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি। বাড়ির দিকে যাবার কথায় অ্যানিসের উৎসাহ বেড়ে গেল। তারা আগে আগে হেঁটে চললো। চলতে চলতেই কথা—রাজনীতি, সাহিত্য এমনকি সিনেমা পর্যায়েও এসে গেল। এরপর এলো ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে দেখলাম, কোনও সংকোচ কোনও দ্বিধা নেই, নিঃসংকোচে প্রশ্ন করে। নিঃসংকোচে প্রশ্নের জবাব দেয়। অ্যানিসের শেষ প্রশ্ন ঃ আমার ছেলে-মেয়ে কটি ? আমি যেই বললাম, একটি মাত্র মেয়ে—নাম নন্দিনী, সে দাঁড়িয়ে পড়ে মুখে হাত দিয়ে বিস্ময়ের সুরে বললো, "একটি মাত্র মেয়ে ? তাহলে তুমি নিশ্চয়ই তোমার স্ত্রীকে ভালবাসনা।"

না, শেষপর্যন্ত অ্যানিসদের বাড়ি পর্যন্ত যাওয়া হয়নি। একটা অছিলা সৃষ্টি করে ফিরে এসেছিলাম। মূল ভাবনা ছিল, যাচ্ছিতো মনের আনন্দে, সন্ধ্যে লেগে গেছে যদি রাস্তা হারিয়ে ফেলি ?

তারপর এভাবে গাইড ছাড়া আমাদের কি বাইরে বেরুনো উচিত?
—অ্যানিসদের সঙ্গ ছেড়ে ফিরে এসেছিলাম বটে; কিন্তু সেইদিন রাত্রে আবার ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলাম। বেরিয়েছিলাম মাঝ রাত্রে একটি অদ্ভুত প্রশ্নের মীমাংসা করতে অ্যানিসদের সঙ্গে রাস্তা ঘুরে ফিরে আসবার পর হঠাৎ রাত্রে দুজনের মধ্যে আলোচনা উঠলো, সোভিয়েত ইউনিয়নে বিদেশীদের ঘেরাফেরা সম্পর্কে; তাদের কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ঘুরতে দেওয়া হয়, সে সম্পর্কে অজস্র কথা শুনেছি। কিন্তু আমরা-যে এতো দিন ধরে রাশিয়াতে আছি, কখনওতো কেউ আমাদের অনুসরণ করছে, আমাদের ওপর নজর রাখছে, এমনতো মনে হয়নি। নিজেরাই আলোচনা করে সিদ্ধান্তে এলাম, হয়তো এমন সূক্ষ্ম ব্যবস্থায় নজর রাখা হচ্ছে যে আমরা টেরই পাচ্ছিনা। তাহলে একবার পরীক্ষা করেই দেখা যাক। এখন রাত দেড়টা বাজে। যদি আমাদের প্রতি নজর রাখার কেউ থাকে, তাহলে সেও নিশ্চয়ই আমাদের অনুসরণ করবে অথবা বেরুতে গেলে নিশ্চয়ই কেউ বাধা দিয়ে বলবে, না, এতো রাত্রে বের হওয়া চলবে না। যে কথা সেই কাজ। রাত দেড়টা নাগাদ আমরা দুজন হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়লাম। ডাইনে-বাঁয়ে সতর্ক নজর রেখে হোটেলের গেটের বাইরে এলাম। তারপর ফাঁকা রাস্তা ধরে এগিয়ে চললাম মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি—কোনও জনপ্রাণী চোখে পড়ে কি-না। এগিয়ে চললাম ততদূর—যতদূর থেকে লেনিন স্কোয়ারের সুউচ্চ লেনিনের প্রতিমূর্তি ও আমাদের হোটেলের চূড়ার আলো দেখা যায়। দীর্ঘ পথ গেলাম, মানুষ দূরে থাক, একটা কুকুরও কোথাও চোখে পড়লোনা। অবশ্য রাশিয়াতে কুকুর চোখে পড়া খুবই কঠিন ব্যাপার। রাস্তায় বেওয়ারিশ কুকুর, গরু, ছাগল ঘুরে বেড়াবে, এটা রাশিয়াতে সম্ভবতঃ কল্পনাতীত ব্যাপার। তারমধ্যে কুকুরের সম্মানতো বোধ হয় গৃহপালিত

জীবকুলের মধ্যে সবচাইতে বেশী। তারা চেন-বদ্ধ থাকেন, আহার-বাস গৃহকর্তা-প্রভুর সঙ্গে ; ভ্রমণ ইত্যাদিও তাই। শীতকালে তো কথাই নেই ; শীতের পোশাক পরে কুকুরের যে জীবনযাপন, তা দেখলে ঈর্ষা না করে পারা যায় না। অবশ্য এটা শুধু রাশিয়াতেই নয়, যে-কোনও শীতপ্রধান দেশেই কুকুর একটু বেশী আদর-যত্নে থাকে আর কুকুরের জন্মহারও বোধহয় কম ; যারফলে খেঁকী ও নেড়ী বেওয়ারিশ হয়ে ঘুরবার সুযোগ পায়না। যেভাবে গিয়েছিলাম, সেইভাবেই ফিরে এলাম। গেট দিয়ে ঢুকে স্বয়ংক্রিয় লিফ্ট-এ নিজেদের আস্তানায় ফিরে এলাম। সেদিনের মতো আমাদের মন আশ্বস্ত হ'ল। না, আমাদের অলক্ষ্যে কেউ আমাদের ওপর নজর রাখছে—এমন সন্দেহের কোন কারণ নেই।

১৯শে নভেম্বর মাঝরাতে আশখাবাদ বিমানবন্দরে নামলুম। তুর্কমেন-এর রাজধানী আশখাবাদ। সেই মাঝরাতে বিমানবন্দরে আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্যে তুর্কমেন-এর বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং নভোস্তি প্রেসের প্রধান কর্মকর্তা লোকজন নিয়ে অপেক্ষা করছেন দেখে অবাক হলাম। প্রকৃতপক্ষে আমরা আশখাবাদে পৌঁছেছি নির্দিষ্ট তারিখের একদিন পরে। বিমানে বসেই ভাবছিলাম, রাতের অবশিষ্ট সময় আমরা বিমানবন্দরেই কাটিয়ে দেবো। কিন্তু দেখলাম, নভোস্তি প্রেসের প্রতিনিধি সবরকম ব্যবস্থাই করে রেখে দিয়েছেন। এবং তিনি গতকালও সারারাত বিমানবন্দরে ছিলেন, আজও রয়েছেন। আমাদের যে হোটেলে নিয়ে যাওয়া হ'ল, সেই হোটেলটির নাম "হোটেল আশখাবাদ"। কিন্তু তুর্কমেনের মানুষরা এই হোটেলের নাম রেখেছে "নেহরু হোটেল"। তুর্কমেনের মানুষরা "হোটেল আশখাবাদ"

বলেনা, বলে "নেহরু হোটেল"। সাংবাদিক বন্ধু ব্যাখ্যা করে বললেন, ১৯৫৫ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু আশখাবাদ এসেছিলেন। সর্বমোট ৪০ মিনিট ছিলেন আশখাবাদে। পণ্ডিত নেহরু আসবার আগেই এই হোটেলটি তৈরী হয়। কথা ছিল নেহরুজীর স্বল্পকালীন অবস্থানে এই হোটেলেই থাকবেন। কিন্তু নেহরুজী বিমানবন্দর থেকেই চলে যান—হোটেলে আর আসেন নি। কিন্তু আশখাবাদের মানুষ হোটেলের নাম নেহরুজীর নামেই রেখে দিয়েছে। যেদিন ১৯৫৫ সালে নেহরুজী বিমানবন্দরে আসেন, সেদিন সকলে গিয়েছিল বিমানবন্দরে। সেদিন নাকি আশখাবাদে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কেউ ঘরে ছিলনা, সবাই ছুটে এসেছিল নেহরুজীকে দেখতে। আজও আশখাবাদবাসীর একপলকে দেখা নেহরুজীর ছবি ও স্মৃতি অম্লান। তাই তিনদিন আশখাবাদ থেকে যখনই যার সাথে কথা বলতে গেছি, সে তখনই প্রথম কথা বলেছে—"জানেনতো, পণ্ডিত নেহরু আমাদের শহরে এসেছিলেন; আমি তাকে দেখেছি।" তুর্কমেনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক সেই সুদূর অতীতকাল থেকে। ভারতের মধ্যে মাদ্রাজের সঙ্গে তুর্কমেনের সম্পর্ক সবচেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠ। তুর্কমেন হ'ল সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্ব দক্ষিণ প্রান্তের দেশ। মাদ্রাজও হ'ল তাই। তুর্কমেনে অনেক মাদ্রাজ-তুর্কমেন ভ্রাতৃসংঘ আছে। এছাড়া রামায়ণ, মহাভারত ও গীতা নিয়ে এতো গবেষণা ও গ্রন্থ তুর্কমেনে আছে যে, সেসব দেখলে মনে প্রশ্ন জাগে, তুর্কমেন সোভিয়েত ইউনিয়নের অঙ্গরাজ্য, না দ্বিতীয় ভারতভূমি।

সোভিয়েত ইউনিয়নের অতি ছোট একটি রিপাবলিক হ'ল তুর্কমেন। এই রিপাবলিকটি গঠিতও হয়েছে অন্য সোভিয়েত রিপাবলিকের অনেক পরে অর্থাৎ ১৯২৪ সালের ২৭শে অক্টোবর।

জনসংখ্যা ও আয়তনের দিক দিয়েও তুর্কমেন খুবই ছোট। কিন্তু তুর্কমেনের প্রাচীনত্ব, সংস্কৃতির মান সোভিয়েত ইউনিয়নের যে-কোন রিপাবলিক অপেক্ষা কম নয়। তুর্কমেনের রাজধানী হ'ল আশখাবাদ। শাসনতান্ত্রিক দিক থেকে এই রিপাবলিক মেরী, টাসাউজ এবং চার্ঝাউ—এই তিনটি ভাগে বিভক্ত। শ্রমিক ও কৃষকদের একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হচ্ছে এই তুর্কমেন সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিক। সামাজিক মালিকানাধীন উৎপাদকদের ওপরই নির্ভর করে তুর্কমেনের অর্থনীতি।

বিপ্লবোত্তর কালে তুর্কমেনের মহিলাদের আলাদা কোন মর্যাদা না থাকার দরুন টাকার বিনিময়ে তাঁদের ক্রীতদাসীর মতো স্বামীর হাতের খেলার পুতুলে পরিণত হতে হতো। যে-কোন ধরনের কঠোর পরিশ্রম ও নোংরা কাজ করতে তাঁদের বাধ্য করা হতো। ১৯৪১ সালে ফ্যাসিস্ট জার্মানী যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর হামলা চালায়, তখন অন্যান্য সকল সোভিয়েত জনগণের হাতে হাত মিলিয়ে তুর্কমেন এই ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। তুর্কমেনের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অন্যান্য কেন্দ্রীয় এশীয়ান রিপাবলিকের চেয়ে তুর্কমেনকেই কঠোর সময়ের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করতে হয় বেশী। খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীতে তুর্কমেন ছিল কৃষক, জেলে ও শিকারীদের বাসস্থান। খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে প্রথম পার্সিয়ান রাজা কাইরাস্ এবং তাঁর দুইশত বৎসর পর আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট এখানে তাঁদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করবার জন্য আসেন। একদা বর্তমান তুর্কমেন ছিল ম্যাসাগেটার ডোমিনিয়ন। ১০ম শতাব্দীর শেষ দিকে আরব সাহিত্যে প্রথম তুর্কমেনের নাম দেখা যায়। তুর্কমেনের জনগণের সবচেয়ে বড় সংগ্রাম করতে হয় জলের জন্য। বর্তমানে অবশ্য আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রয়োগের ফলে

চাষ-বাসের ক্ষেত্রে জলসেচ ব্যবস্থার অনেকটা উন্নতি সাধিত হয়েছে। যদিও ১৯শ' শতাব্দীর শেষ দিকে তুর্কমেন প্রথম রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে; কিন্তু ১৮শ' শতাব্দীর ইণ্টারনেসাইন যুদ্ধের ফলে দেশটি একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। বিশেষকরে অশিক্ষা, দারিদ্র্য প্রভৃতি দেশের অর্থনীতিকে একেবারে পঙ্গু করে দেয়। এরপর ক্রমে কৃষিক্ষেত্রে অধিক গুরুত্ব আরোপ করায় কৃষিকাজের যথেষ্ট উন্নতি হতে থাকে। ক্রমে শহরটি বিদ্রোহ-আন্দোলনের কেন্দ্রে পরিণত হয়। এর প্রমাণ মেলে ১৯০৫-০৭ সালে সংঘটিত রাশিয়ান বিদ্রোহ-র সময়। তুর্কমেন এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। তখন আশখাবাদ থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হতো লেনিনের নিষিদ্ধ পত্রিকা।

১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে অর্থাৎ পেত্রোগ্রাদ-এর মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর ট্রান্সকাস্পিয়ান-এ সোভিয়েত আইন প্রতিষ্ঠিত করলো এবং ১৯১৮ সালের এপ্রিল মাসে তুর্কেস্তান-এর পঞ্চম সোভিয়েত কংগ্রেস পত্তন করলো—তুর্কেস্তান স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সোস্যালিস্ট রিপাবলিক—যা ছিল রাশিয়ান ফেডারেশনের সঙ্গে যুক্ত। ১৯২০ সালে বলশেভিক-দের নেতৃত্বে যে সংগ্রাম হয়, কর্মরত লোকেরা তখন তাদের স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ১৯২৫ সালে তুর্কমেনের প্রথম শাসনতন্ত্র রচিত হয় এবং ১৯২৫ সালের মে মাসে তুর্কমেন একটি শাসনতান্ত্রিক রিপাবলিকের রূপ নেয়।

দিনের আলোয় আশখাবাদকে দেখলাম। দেখলাম, বেশ কিছুটা বিস্ময়ের চোখ নিয়ে। ১৯৪৮ সালের ভয়াবহ ভূমিকম্পের কথা শুনেছি; সেই ভূমিকম্পে ধ্বংসের কাহিনীও জানি; কিন্তু

সেই ধ্বংসস্তুপের 'পরে এমন একটি মনোরম শহর গড়ে উঠতে পারে, শিল্প-নগরী গড়ে উঠতে পারে, এটা কল্পনা করা যায় না। কল্পনা করা যায় না আরো এই কারণে যে, এই শহরকে গড়ে তোলা হয়েছে—ভূমিকম্প প্রতিরোধে সক্ষম করে। তুর্কমেন ছোট্ট দেশ। কিন্তু তিনটি বিষয় যেমন গর্বের, তেমন বিস্ময়ের। প্রথম হলো. ভূমিকম্প-প্রতিরোধে সক্ষম ব্যবস্থার ভিত্তিতে শহর গড়ে তোলা; দ্বিতীয় হলো মরু-বিজয় অর্থাৎ মরুভূমি বিজয় করে সেখানে সৃষ্টি হয়েছে জলাধার, সৃষ্টি হয়েছে শত শত মাইল বিস্তৃত খাল; তৃতীয় বিস্ময় হ'ল কার্পেট। কার্পেট যে কতো সুন্দর হতে পারে, কতো সূক্ষ্ম হতে পারে, সেটা তুর্কমেনের রাষ্ট্রীয় কার্পেট কারখানিগুলি না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আরেকটি ব্যাপার অবশ্য তুর্কমেনে লক্ষ্যণীয়—সেটা তুর্কমেনীদের রামায়ণ-চর্চা। মিঃ স্পার্নভ্ যেভাবে মহাভারতের ওপর কাজ করেছেন, সেটা শুনলে শ্রদ্ধায় মাথা নীচু হয়, আবার গর্বে বুক ভরে ওঠে। মিঃ স্পার্নভ্ ছিলেন একজন সামরিক ডাক্তার। ১৯১৯ সালে কিয়েভে একখণ্ড সংস্কৃত মহাভারত পেয়ে যান। তারপর নিজে সংস্কৃত শিখে এগারো খণ্ড মহাভারত রুশ ভাষায় অনুবাদ করেছেন। গীতা অনুবাদ করেছেন। জীবনের শেষ দশ বছর পক্ষাঘাত রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন, সেই অবস্থাতে এই আশখাবাদ শহরে থেকে মহাভারতের অনুবাদকাজ শেষ করেন। ৩০ হাজার সংস্কৃত শ্লোক অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। লেনিনগ্রাদে মহাভারত দুই পর্বে প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আর্মেনিয়াতে প্রকাশিত হয়েছে এগারো পর্বে। ১৯৬৬ সালে তৎকালীন ভারতীয় রুশ রাষ্ট্রদূত শ্রী কে. পি. এস. মেনন আশখাবাদ শহরে এসে এই ভারতপ্রেমী পণ্ডিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভারতীয়দের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানিয়ে যান। ১৯৬৭ সালে ডাঃ স্পার্নভ্ মারা যান। মারা যাওয়ার পর দেখা যায়, তিনি একখানা উইল করে গেছেন, যে

উইলের বক্তব্য হ'ল—তাঁর এই মহাভারত, গীতা ও অন্যান্য সংস্কৃত শ্লোকসংকলিত গ্রন্থ বিক্রয়ে যে-অর্থ লেখকের প্রাপ্য, সেই অর্থ যেন ভারতের কাজে ব্যয় করা হয়। মিঃ স্পার্নভ্ ছিলেন সামরিক ডাক্তার ; কখনও ভারতবর্ষে আসেন নি, ভারতবর্ষ দেখেন নি ; কিন্তু এইভাবে মহাভারত-গীতা অনুবাদ থেকে শুরু করে সমস্ত অর্থ ভারতের উদ্দেশ্যে উৎসর্গের নজীর পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি আছে বলে আমার জানা নেই। আশখাবাদ শহরে এসে প্রথমে পেলাম "নেহরু হোটেল"—যে হোটেলে নেহরু আসেন নি, এবং শুধু আসবেন বলে তৈরী হয়েছিল, সেই হোটেলকে তুর্কমেনীরা "নেহরু হোটেল" বলে স্মরণীয় করে রেখেছে। আর মিঃ স্পার্নভ্ যিনি ভারতকে দেখেননি, যিনি ভারতে আসেন নি, তিনি ভারতের জন্যে তাঁর জীবনের সঞ্চিত ধন, জীবনের সর্বাধিক সময় দিয়ে গেছেন।

২০শে নভেম্বর আমরা আর্মেনীয় লেখক সমবায় দপ্তরে উপস্থিত হলাম। বেশ কয়েকজন প্রখ্যাত লেখক আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। তিনতলা বাড়ি, সাজানো হল-ঘরে আমাদের সঙ্গে লেখক-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীদের বৈঠক। আহার-জলযোগেরও ব্যবস্থা টেবিলে সাজানো রয়েছে। প্রথমে শুরু হলো খোশ গল্প। বৈঠকে উপস্থিত যাঁরা ছিলেন তার মধ্যে দু'তিনজন সাহিত্যিক একাধিকবার ভারতে এসেছেন। পশ্চিমবাংলায়ও এসেছেন। কলকাতার সাংবাদিক-সাহিত্যিকদেরও জানেন, দু'একজনের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ও আছে। অনেক বই আলমারিতে সাজানো রয়েছে, তারমধ্যে দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ, প্রেমচাঁদ, কিষাণ চন্দ, খাজা আহম্মদ আব্বাস, ধূর্জ্জটী প্রসাদ মুখার্জী প্রমুখ লেখকদের বই। কথা চলতে চলতে আমরা আমাদের লক্ষ্য মতো কথাকে নিয়ে এলাম বিক্ষুব্ধ লেখকদের প্রসঙ্গে। অর্থাৎ সেই সোলঝে-

নিৎসিন-সাখারোভ্ প্রসঙ্গে। জিজ্ঞাসা করলাম; আপনাদের এখানে বিক্ষুব্ধ লেখক কেউ আছেন নাকি? আমাদের মুখে বিক্ষুব্ধ লেখক সোলঝেনিৎসিন প্রসঙ্গ শুনে লেখক-সাংবাদিকরা রুশ ভাষায় নিজেদের মধ্যে দু'একটা কথা কি যেন বলাবলি করলেন, তারপর যাকে বলে শুরু হলো ধোলাই। এক একজন বলে যাচ্ছেন আর দোভাষী অনুবাদ করে আমাদের শোনাচ্ছেন। সকলের দীর্ঘ বক্তব্য এক করলে যে সারাংশ পাওয়া যায়, তাহলো এই—"মশাই, আপনারা কি পাগল? বিক্ষুব্ধ লেখক বলে কোনও কথাই হয় না। আর মার্কিনী প্রচারের দৌলতে যাদের বিক্ষুব্ধ লেখক বলে চিত্রিত করা হয়েছে, তারা হলো আসলে রোগগ্রস্ত। শরীরের একটা রোগ কখনও দেখা দেয়, চিকিৎসার পর নিরাময় হয়, কাজেই রোগটাই মানুষ—এ বিচারের অবকাশ কি কখনও ঘটে?" দেখলাম লেখক-সাংবাদিকদের নোবেল পুরস্কারের 'পরেও তীব্র ঘৃণা। বললেন, আলফ্রেড নোবেলদের তেলের খনি ছিল এই তুর্কমেনে। এখানেই ছিল তাদের মজুর-ব্যারাক্। দেশের মানুষকে শোষণ করে যে সম্পদ রেখে গেছে, তাই আজ পুরস্কারের নামে ব্যয় করা হচ্ছে। সম্পদের উৎস যাই হোক, সুইডিশ অ্যাকাডেমী, যারা নোবেল পুরস্কার দেয়, তারা তাদের নির্বাচনেও যেমন গণতান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনার আমল দেয়না, তেমনি তারা এ পুরস্কার দেয় রাজনীতি করবার জন্যে। সোভিয়েত রাশিয়া থেকেও লেনিন পুরস্কার, শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়। কিন্তু সেই পুরস্কার কমিটিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের 'প্রতিনিধিরাও আছেন—এমনকি ভারতের প্রতিনিধিরাও আছেন। কিন্তু সুইডিশ কমিটিতে তাদের কয়েকজন পেটোয়া লোক ছাড়া কেউ নেই। সেই কয়েকজন পেটোয়া লোকই হ'ল বিচারক, যারা বিশ্বের সাহিত্যিকদের সাহিত্য-কর্ম বিচার ক'রে, বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানের

আবিষ্কার বিচার ক'রে, পুরস্কার দিয়ে থাকে। কাজেই এই বিচারকদেরও কোনও দাম নেই, পুরস্কারেরও কোনও দাম নেই। আর একজন বললেন, নোবেল পুরস্কার হ'ল একটা নিন্দনীয় রাজনৈতিক চালবাজি। তাই যদি না হবে তবে সোলঝেনিৎসিনকে পুরস্কার দেওয়া হলো কেন? সাহিত্য-কর্মে সোলঝেনিৎসিনের অবদান কি এমন, যাতে এই নোবেল পুরস্কার দেওয়া হ'ল? আসলে ওরা সোলঝেনিৎসিনকে নিয়ে রাজনীতি করবার সুযোগ পেয়েছে, সেই সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করছে। বোরিস পাস্তার্নকের পর সোলঝেনিৎসিনকে নিয়ে অতিগরমবাজদের এটি হ'ল দ্বিতীয় খেলা। সোভিয়েত রাশিয়াতে অনেক বড় এবং ভালো লেখক আছেন, এঁদের কথা কারও অজানা নয়। কিন্তু তাদের সকলকে ভুলে সোলঝেনিৎসিনকে নিয়ে যে নাচবার চেষ্টা—সেটা হ'ল এই কারণে যে, সোলঝেনিৎসিন সোভিয়েত আদর্শের ও চিন্তা-ভাবনার কিছু বিরোধিতা করেছেন। সেই বিরোধিতাটুকুই হ'ল ওদের পুঁজী। সোলঝেনিৎসিনের তুলনায় পাস্তার্নক অনেক উঁচুমানের লেখক। সোভিয়েত রাশিয়ার কোনও দোষ-ত্রুটি নেই, পথ চলায় কোনও ভ্রান্তি নেই—একথা কেউ বলেনা। লেনিনও বলে গেছেন, "ভুলত্রুটি নিশ্চয়ই আছে, তবে দেখতে হবে মূলপথে ভুল আছে কি না।" লেখকদেরও সব লেখা ত্রুটিমুক্ত হবে—এমন কথা ঠিক নয়। তলস্তয়, দস্তয়ভোস্কির বহু লেখা প্রতিক্রিয়াপন্থী। গোর্কীকেও লেনিন তাঁর কিছু কিছু লেখার জন্য সমালোচনা করেছেন। সবশেষ কথা হ'ল, লেখকের স্বাধীনতা বলতে কোনক্রমেই এই স্বাধীনতা বোঝায়না, তিনি জনমতকে বিপথগামী করবেন, বিভ্রান্ত করবেন অথবা প্রগতির পথে বিঘ্ন ঘটাবেন। আমাদের সঙ্গে আলোচনায় সোভিয়েত লেখকদের নেতৃত্ব করছিলেন রহিম

ইসানভ। মিঃ ইসানভ সোভিয়েত লেখক সংঘের অন্যতম সম্পাদক এবং প্রাভদা পত্রিকার সাংবাদিক।

মিঃ ইসানভ বললেন, "আমি কোনও গবেষণার কথা বলতে চাইনা, আমি সাংবাদিক, আমি এইটুকু বলতে পারি—আমার লেখায় অনেকের জেল হয়েছে, অনেককে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হতে হয়েছে, অনেককে নানারকম শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। কাজেই আমার এই স্বাধীনতা কখনও ক্ষুণ্ণ হয়নি, যাতে সত্য কথা লিখতে বিঘ্ন ঘটেছে। আমি সত্য কথা লিখেছি, এবং অন্যকে তার ফল ভোগ করতে হয়েছে।"

এরপর আমরা বললাম, সোলঝেনিৎসিনের বই সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রকাশিত হচ্ছেনা ; কিন্তু পশ্চিমী দেশগুলিতে প্রকাশিত হয়ে হাজার হাজার কপি চোরাই পথে রাশিয়াতেই আসছে, কথাটা কি ঠিক ?—মিঃ ইসানভ ও তাঁর সঙ্গীরা চটপট জবাব দিলেন এবং খোলাখুলিভাবে জানালেন প্রশ্নের জবাব। তাঁরা বললেন, "সোভিয়েত ইউনিয়নে গ্রন্থ প্রকাশের দায়িত্ব সরকারের। তাই লেখকসমিতি সরকার-বিরোধী কোনো বই প্রকাশের জন্য সুপারিশ করতে পারে না। আমাদের একটা আদর্শগত ভিত্তি আছে। আমরা সমাজবাদের সমর্থক। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও আদর্শ খুব স্পষ্ট। লেনিন বলেছেন, "কোনো ব্যক্তি একই সঙ্গে সমাজের মধ্যে ও বাইরে, থাকতে পারেনা।" বুর্জোয়া গণতন্ত্র আমাদের আদর্শ বিরোধী ; তাই সরকারী অর্থের বিনিময়ে এই আদর্শ আমরা প্রচার করতে পারিনা।" ইসানভ বললেন যে, "শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানের নীতি অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা চলে, আদর্শের ক্ষেত্রে নয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজবাদের আদর্শ-বিরোধী কোনো কিছুই প্রকাশ করেনা। এর অর্থ কিন্তু এই নয় যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রকৃত মহৎ লেখকরা পশ্চিমী

দুনিয়ায় অপরিচিত রয়ে গেছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে পশ্চিমী দেশগুলির দৃষ্টিভঙ্গী নিরপেক্ষ নয়। তারা শুধু সোভিয়েত বিরোধী লেখকদেরই প্রচার করে থাকে। আমরা আমাদের ত্রুটি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন আছি। আমাদের সৎ লেখকেরা তা নিয়ে চিন্তা করছেন। কিন্তু সোলঝেনিৎসিনের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গী পক্ষপাতদুষ্ট। তিনি শুধু রাশিয়ার একপেশে চিত্র অঙ্কন করে যাচ্ছেন—জীবনের অন্ধকার দিকটা তুলে ধরছেন, উজ্জ্বল দিকটা দেখাচ্ছেন না। এই কারণেই সারা পৃথিবীর বুর্জোয়া গণতন্ত্র সোলঝেনিৎসিনের প্রশংসায় এমন মুখর হয়ে উঠেছে।" ইসানভ জানালেন, "সোভিয়েতে যদিও সম্প্রতি সোলঝেনিৎসিনের বই আর প্রকাশিত হচ্ছেনা, তবু তাঁর পক্ষে আকাদেমীর সদস্য থাকতে বাধা নেই। আকাদেমীর সদস্য থাকলে এখনও তিনি তা থেকে নানারকম সুযোগসুবিধা পেতে পারতেন; কিন্তু তিনি নিজেই তাঁর "মেম্বারশিপকার্ড" ফেরত দিয়েছেন।"

এবারে শেষ প্রশ্ন: বিশেষ করে লেখকরাই কেন সোভিয়েত রাশিয়ায় বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন?—এর উত্তরে ইসানভ বললেন, সোলঝেনিৎসিনের সোভিয়েত-বিরোধী মতামত সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজবাদী কাঠামোর কোনো ত্রুটি থেকে উদ্ভূত হয়নি। এর পিছনে হয়তো ব্যক্তিগত মানসিক প্রবণতা ও চরিত্রগত মুদ্রাদোষ ইত্যাদি থাকতে পারে। তলস্তয়, দস্তয়েভস্কি, গোর্কি প্রভৃতি বিশ্বখ্যাত লেখকদেরও ত্রুটি ছিল। তাঁদের কোনো কোনো লেখা ছিল প্রতিক্রিয়াশীল। লেনিন গোর্কিকেও সমালোচনা করতে ছাড়েন নি। লেখকদের এইজাতীয় আদর্শচ্যুতি ও মানসিক উচ্ছৃঙ্খলতার কারণ খুঁজতে হবে তাদের ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। ঘণ্টা চারেক বৈঠকের পর আমরা দেখলাম—মস্কো নয়, লেনিনগ্রাদ নয়, মস্কো-লেনিনগ্রাদ থেকে বহু হাজার মাইল দূরেও সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীরা সোলঝেনিৎসিন সম্পর্কে

তাঁদের মনের তার বেঁধে রেখেছেন অভিন্ন সুরে। ফল হ'ল এই, আমরা এখানেও সোলঝেনিৎসিন-সাখারভ প্রসঙ্গ তুলে খুব একটা জুৎ করতে পারলুম না। ইসানভের শেষ কথা, সোলঝেনিৎসিন আলো নয়, অন্ধকারের প্রতিনিধি। তাই রাশিয়ার অন্ধকার একটি দিক, যার বেশীর ভাগই কল্পনা—তা তুলে ধরেছেন তাঁর লেখায়।

আমরা এবার দেখতে গেলাম একটা বোর্ডিং স্কুল। রাশিয়ায় এসে এদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা, শিক্ষার অগ্রগতি এবং শিক্ষার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছি, পড়া শুরু করেছি, প্রত্যক্ষভাবে মিলিত হয়েছি অনেকের সঙ্গে। তুর্কমেনে এসে একটা বোর্ডিং স্কুলে আমরা একটা দিন কাটাবো, এটা আগেই ঠিক ছিল। রবীন্দ্রনাথের "রাশিয়ার চিঠি"তে তুর্কমেনের শিক্ষা ও কৃষি ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেছিলাম। রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া গিয়েছিলেন রুশ বিপ্লবের মাত্র তের বছর পরেই। কিন্তু তখনই রাশিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থা দেখে শুধু মুগ্ধ হননি, নিজেকে উদ্‌বুদ্ধ করেছিলেন রুশ শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "রাশিয়ার চিঠি"তে লিখেছেন, "শিক্ষার বিরাট পর্ব আর কোনো দেশে এমন করে দেখিনি, তার কারণ অন্য দেশে শিক্ষা যে করে শিক্ষার ফল তারই—"দুধুভাতু খায় সেই"। এখানে প্রত্যেকের শিক্ষা সকলের শিক্ষা। একজনের মধ্যে শিক্ষার যে অভাব হবে, সে অভাব সকলকেই লাগবে। কেননা সম্মিলিত শিক্ষারই যোগে এরা সম্মিলিত মনকে বিশ্ব সাধারণের কাজে সফল করতে চায়। এরা "বিশ্বকর্মা", অতএব এদের বিশ্বমনা হওয়া চাই। অতএব এদের জন্যেই যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষা ব্যাপারকে এরা নানা প্রণালী দিয়ে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে ম্যুজিয়ম। নানা প্রকার ম্যুজিয়মের জালে এরা সমস্ত গ্রাম শহরকে 'জড়িয়ে ফেলেছে। সে ম্যুজিয়ম

আমাদের শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরির মতো অকরী নয়, সকরী। আমি নিজের চোখে না দেখলে কোনোমতেই বিশ্বাস করতে পারতুম না যে, অশিক্ষা ও অবমাননার নিম্নতল থেকে আজ কেবল মাত্র দশ বছরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এরা শুধু ক খ গ ঘ শেখায়নি, মনুষ্যত্বে সম্মানিত করেছেন। শুধু নিজের জাতকে নয়, অন্য জাতের জন্যেও এদের সমান চেষ্টা। অথচ সাম্প্রদায়িক ধর্মের মানুষেরা এদের অধার্মিক বলে নিন্দা করে। ধর্ম কি কেবল পুঁথির মন্ত্রে? দেবতা কি কেবল মন্দিরের প্রাঙ্গণে? মানুষকে যারা কেবলই ফাঁকি দেয় দেবতা কি তাদের কোনোখানে আছে?"

আমরা যে বিদ্যালয়টিতে উপস্থিত হলাম তার নাম আশখাবাদ বোর্ডিং স্কুল। আমরা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতেই প্রধানা শিক্ষয়িত্রী, কয়েকজন শিক্ষিকা আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। তারপর ঘুরে ঘুরে দেখলাম ক্লাসগুলো। ক্লাসরুমগুলো আমাদের দেশের শুধুমাত্র চেয়ার-টেবিল-বেঞ্চ ও একখানা ব্ল্যাকবোর্ডে সম্পূর্ণ নয়। প্রতিটি ক্লাসই নানাপ্রকার নমুনা-দ্রব্য ও ছোটখাটো প্রদর্শনী বিশেষ। ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভূগোল, স্বাস্থ্য সব ঘরই নানাপ্রকার পোস্টার, ছবি, মূর্তি দিয়ে সাজানো। আমরা ক্লাশে যেতেই ছাত্রীরা আমাদের অভ্যর্থনা জানায়, তারপর শুরু হয় দোভাষীর মাধ্যমে মতবিনিময়। প্রথমে আমরা প্রশ্ন করি তাদের লেখাপড়া সম্পর্কে, জীবনযাপন সম্পর্কে, ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশ সম্পর্কে। এক একজন উঠে দাঁড়িয়ে তাদের ভাষায় কথা বলে। ভারতবর্ষ সম্পর্কে জ্ঞান যদিও যথেষ্ট নয়, কিন্তু তুলনামূলক ভাবে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের চেয়ে নিশ্চয়ই বেশী। ইতিহাস-ভূগোলের ঘরে ভারতবর্ষ সম্পর্কে অনেক তথ্য আছে, সেই সঙ্গে আধুনিক ভারতের নানা ছবিও রাখা

আছে, যেগুলি এইসব শিশুদের জ্ঞান আহরণের উৎস। এই স্কুলেই শুধু দেখলাম ছেলেমেয়েদের কাছে রাজ এবং রীতা বেশ পরিচিত নাম। সবশেষে আমরা গেলাম ছেলেমেয়েদের থাকবার জায়গা ও বিশ্রামাগারে। ৪৫০টি ছেলেমেয়ে এই বোর্ডিং-এ থাকে, প্রত্যেকের খাট-বিছানা, পড়ার টেবিল-চেয়ার-আলমারি আলাদা। ছদিন স্কুল হয়, ছুটির দিন যাদের বাড়ি যাওয়ার তারা বাড়ি চলে যায়, অন্যদের স্কুল থেকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়। এছাড়া বছরে দূর কোনও অঞ্চলে একবার করে ছুটির অবকাশে নিয়ে যাওয়া হয়, ছেলেমেয়েরা সমস্ত ছুটিটা সেখানে অবকাশযাপন করে। স্কুলের মধ্যেই খেলাধুলা থেকে আরম্ভ করে চিকিৎসার পর্যন্ত স্ব-নির্ভর ব্যবস্থা রয়েছে। রাশিয়ার বিদ্যালয় ও ইনস্টিটিউটগুলি দেখে বারে বারে যে কথাটা মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের স্বপ্ন বুঝি রাশিয়াতেই সফল রূপ পেয়েছে।

১৯১৪-১৫ সালে শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে তুর্কমেনের জনগণ অত্যন্ত পিছিয়ে ছিল। না ছিল সেখানে স্কুল-কলেজের যথাযথ ব্যবস্থা, না ছিল তুর্কমেন ভাষায় একখানি বই। যার ফলে শিক্ষার মান ছিল অত্যন্ত নীচে। জারশাসিত রাশিয়ার শিক্ষাক্ষেত্রের পরিস্থিতি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে একদা লেনিন তিক্ততার সঙ্গে বলেছিলেন যে, "অপর কোনও দেশের জনগণ শিক্ষা ও সংস্কৃতি থেকে এতো বেশী বঞ্চিত নয়।" ১৯১৭ সালের মহান অক্টোবর বিপ্লবের আগে সমগ্র রাশিয়ার বয়স্ক জনসাধারণের আনুমানিক ৭৬ শতাংশ ছিলেন নিরক্ষর এবং বহুজাতির নিজস্ব কোনও লিখিত ভাষা ছিল না। কিন্তু সোভিয়েত সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর শিক্ষাক্ষেত্রের সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ করে শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করে দেওয়া হয়, এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে বসবাসকারী সকল জাতির আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসা হয়। ১৯১৯ সালে অষ্টম পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত

কর্মসূচীতে একটি একক বৃত্তিমূলক স্কুল ব্যবস্থার মধ্যে ১৭ বছরের কমবয়সী সমস্ত ছেলেমেয়ের জন্য বিনাবেতনে ও বাধ্যতামূলক সাধারণ ও পলিটেক্‌নিক্যাল শিক্ষার প্রবর্তন করা হয়। মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের দরুন যে অবিশ্বাস্য বাধাবিঘ্ন এসেছিল, সেগুলিকে কাটিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বাভাবিক ভাবে চালু রাখার জন্য সোভিয়েত সরকার সম্ভাব্য সব কিছু করেছে। এই শিক্ষা সংস্কারের প্রভাব ক্রমশঃ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রজাতন্ত্রগুলির ওপর পড়ে। শিক্ষার এই প্রসারতায় অন্যান্য প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে এগিয়ে আসে তুর্কমেন।

১৯৫১ সালে তুর্কমেনের রাজধানী আশখাবাদ-এ প্রতিষ্ঠিত হয় "দি অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস অব দি তুর্কমেন এস এস আর।" এর মোট সদস্যসংখ্যা ৪৩। দর্শন, আইন ও অন্যান্য বহুবিষয় নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে এই একাডেমি অব সায়েন্সের গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ১,৬৪৮টি বিদ্যালয়। ২৯,০০০ ছাত্র-ছাত্রীকে উচ্চশিক্ষা দেবার জন্য রয়েছে ৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অপর ২৯,০০০ ছাত্রছাত্রীর জন্য রয়েছে বিশেষ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহ। এ ছাড়াও রয়েছে অবাধে পড়াশোনা করবার জন্য প্রচুর সংখ্যক পাবলিক লাইব্রেরি। সোভিয়েত শাসনের প্রথম দিনটি থেকেই জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সেখান থেকে আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। তুর্কমেনে পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত বাধ্যতামূলক স্কুল-শিক্ষার প্রবর্তন করা হয় এবং নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত বাধ্যতামূলক সম্পূর্ণ শিক্ষাগ্রহণ চালু করা হয়, যার ফলশ্রুতি হিসাবে তুর্কমেন তথা সোভিয়েত ইউনিয়নই এখন পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র দেশ, যেখানে শতকরা একশত জনই শিক্ষিত।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কোথাও স্কুল-শিক্ষার কোনও পর্যায়েই

কোনও খরচ লাগেনা। স্কুল, গ্রন্থাগার, গবেষণাগার, জিমন্যাসিয়াম ও অন্যান্য সুবিধার জন্য কোনও খরচ দিতে হয়না। যে-সমস্ত শিশুদের মা-বাবারা আর্থিক দিক থেকে অসুবিধাগ্রস্ত, তাদের বৈষয়িক সাহায্য দেওয়া হয় এবং তা পরিশোধ করতে হয়না। শ্রমশিক্ষা-ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রীদের জন্য গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। চতুর্থশ্রেণী থেকে শেখানো হয় হস্তশিল্প। এর উদ্দেশ্য—ছেলেমেয়েদের আধুনিক উৎপাদনের নীতিগুলি ও পলিটেকনিক্যাল কলাগুলি সম্বন্ধে তাদেরকে খানিকটা ধারণা দেওয়া এবং সেগুলিকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের যোগ্যতা অর্জন করতে শেখানো। ১৯৬৮ সালের হিসাবে দেখা যায়, জনশিক্ষার জন্য ১,৬০০ কোটি রুবল ব্যয় করা হয় এবং এই ব্যয়ভার বহন করে রাষ্ট্রীয় বাজেট, রাষ্ট্রীয় ও সমবায় ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, যৌথ খামারের তহবিল এবং অপরাপর জন-প্রতিষ্ঠান। শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্ত নাগরিকের সমান অধিকার নিশ্চিত করে জনসংখ্যার সমাজতান্ত্রিক সংগঠনের যে নীতিসমূহ—সেগুলি হ'ল: শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ঐক্য ও ধারাবাহিকতা, সমস্ত স্তরে গণতান্ত্রিক স্কুলের ব্যবস্থা, শিক্ষার ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র, শিক্ষায় স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার, মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নের সকল জাতির সমান অধিকার, জীবনের সঙ্গে এবং কমিউনিস্ট নির্মাণের ব্যবহারিক দিকগুলির সঙ্গে স্কুলের সংযোগ, ছাত্রছাত্রীদের বয়সের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাদের সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রমের সঙ্গে শিক্ষার সমন্বয় সাধন, স্কুলের সঙ্গে অপরাপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের, জনসাধারণের, গণ-প্রতিষ্ঠানগুলির এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে সংযোগ। সোভিয়েত ক্ষমতার প্রতিষ্ঠার পর থেকে সোভিয়েত উচ্চতর শিক্ষাসহ বিশেষ জ্ঞানলাভের প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষিত

প্রায় ৭৫ লক্ষ উচ্চতর শিক্ষাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ এবং বিশেষ জ্ঞানের মাধ্যমিক স্কুলগুলিতে শিক্ষিত ১ কোটি ২০ লক্ষেরও উপর বিশেষজ্ঞ বেরিয়েছেন।

বর্তমানে জাতীয় অর্থনীতিতে উচ্চতর বা মাধ্যমিক বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত ১ কোটি ৩০ লক্ষেরও বেশী লোক নিয়োজিত আছেন। তাঁদের মধ্যে আছেন ২০ লক্ষ এঞ্জিনিয়ার, ২৬ লক্ষের উপর শিক্ষক, প্রায় ৬ লক্ষ ডাক্তার ও বিশেষজ্ঞ।

২১শে নভেম্বর দেখলাম, মানুষের মরুবিজয়ের দৃশ্য। কারাকুম মরুভূমির বুকে খাল কেটে জল এনে মরুপ্রান্তরকে করা হয়েছে শস্যশ্যামল। উত্তর পশ্চিমে আমুদরিয়া থেকে আশখাবাদ পর্যন্ত সমুদ্রের বালু কেটে সেখানে প্রবাহিত করা হয়েছে স্বচ্ছ জলের ধারা। মুরগাব তেজেন—মরূদ্যান কোপেতদাগ, আশখাবাদ, গোয়েকতেপের বিশাল যে এলাকা ছিল প্রাণহীন, বন্ধ্যা মরুপ্রান্তর, মানুষ ও যন্ত্র সেই বিশাল এলাকাকে উদ্যানে পরিণত করেছে, ক্ষেত-খামারে পরিণত করেছে।

সকালবেলায় আমরা বিমানে প্রায় পাঁচশ' কিলোমিটার দূরে এক মরূদ্যানে অবতরণ করলাম। এই মরূদ্যানটির নাম মারী—বিমান ক্ষেত্রটির নামও মারী। মারী থেকে পৌঁছলাম বৈরামআলি, বৈরামআলি থেকে রওনা হলাম আতাজানবের উদ্দেশ্যে। পথে পড়লো দ্বাদশ শতাব্দীর এক সুলতানের কবর—এখানে একটি বৌদ্ধস্তূপও আবিষ্কৃত হয়েছে। মরুভূমির মধ্যে কয়েকশ' ফুট উঁচু সুলতানের কবর দেখে নিশ্চিত বোঝা যায়, একদা ঐ অঞ্চলে জাকজমকপূর্ণ নগরের উপস্থিতি ছিল। কালের গর্ভে নগরের অবলুপ্তি ঘটেছে, কিন্তু ধ্বংসকে জয় করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে কবরটি। কবরের চারিধারে জমি ও মাটি লক্ষ্য করলে বোঝা যায় সমগ্র এলাকাটিই একটি ধ্বংসস্তূপ। এখানে বৌদ্ধস্তূপ বলে

যা দেখানো হ'ল সেটিও খুবই পুরাতন। ঐতিহাসিকরা হয়তো গবেষণা করে বলতে পারেন—ইতিহাসের কোন সন্ধিক্ষণে মুসলমানের কবর আর বৌদ্ধস্তুপ পাশাপাশি স্থাপিত হয়েছিল। আমরা শ'দেড়েক কিলোমিটার অতিক্রম করে উপস্থিত হলাম আতাজানবে কারাকোরাম রাষ্ট্রীয় খামারে। খামারের খামারীরা আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। এই খামারেই আছেন একজন ট্রাক্টর চালক, যিনি সুপ্রীম সোভিয়েতের ডেপুটী। তিনি হলেন ইয়ারমার্মোদভ্। খুব ইচ্ছা ছিল ইয়ারমার্মোদভের সঙ্গে দেখা করার; কিন্তু তিনি অনেক দূরে ট্রাক্টর দিয়ে জমি চাষ করছেন, কাজেই তাঁকে ডেকে আনা সময়সাপেক্ষ; তাছাড়া কাজের সময় কাজ ফেলে চলে আসা—এটা ওঁরা কল্পনা করতে পারেননা। এই খামারে চাষের জমি, উৎপাদন, শস্য-সামগ্রী সম্পর্কে তথ্যাদি জেনে নেবার পর আমাদের ঘুরিয়ে দেখানো হ'ল খামারের আবাসিক এলাকা। মনে মনে ভাবলাম, এই যদি হয় খামার, তবে স্বয়ংসম্পুর্ণ নগর-জীবন কাকে বলে? হাসপাতাল আছে ৭৫ বেডের, ক্লাব, সিনেমা হল, খেলাধুলার হেন সামগ্রী নেই, যা এই ক্লাবে না আছে। ৫টি আছে 'ক্রেস' (শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের স্থান), ৪টি বিদ্যালয়, ১টি বক্তৃতামঞ্চ সহ সভাগৃহ—সেখানে চিত্র প্রদর্শনী ও অন্যান্য প্রদর্শনীর স্থায়ী ব্যবস্থা। একসময় একজনকে একটু চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের এখানে টেলিভিশন আছে? ভদ্রলোক বললেন, "টেলিভিশন ছাড়া আবার মানুষ বাস করতে পারে নাকি?"—অর্থাৎ সব ঘরে টেলিভিশন আছে। সব ঘুরেফিরে দেখবার পর আমাদের জন্য কিছু আহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে একটা গেষ্ট-রুমে নিয়ে যাওয়া হ'ল। খামারের কর্তারা কয়েকজন ও আমরা একটা টেবিল ঘিরে বসলাম। খামারের কর্তা হুকুম করলেন, মেহমানদের খানা নিয়ে এসো। ঘড়ির কাঁটায় বেঁধে মেহমানদের

কর্মসূচী একমিনিট এদিক-ওদিক করা চলবেনা। যে মাত্র হুকুম সেইমাত্র টেবিলের 'পর খানা আসতে শুরু করলো দু'এক মিনিট তাকিয়ে থেকে চোখ বন্ধ করলাম। মনে মনে দুর্গানাম জপ করা ছাড়া আর কিছু আসছিলনা। যখন চোখ খুললাম তখন দেখলাম, সবশুদ্ধ আমরা জনাদশেক লোক। টেবিলটা আয়তনে সম্ভবত দশফুট ছ'ফুট হবে। সেই টেবিলের 'পর সাজানো চিনে মাটির ডিশ্ ও বাটিতে খাবার। চেহারা দেখে তিনটি জিনিসকে চিনতে পেরেছিলাম। একটা হ'ল—আস্ত মুরগী, সংখ্যায় গোটা পঞ্চাশ, টমেটো সের দশেক, আর কালো রুটি কিছু না হলেও পাউণ্ড তিরিশ। যাদের চিনতে পারিনি, তারা কেউ গরুর মাংস, কেউ শুয়োরের মাংস, আরো যে কি কি ছিল, বলতে পারবোনা। আর ছিল সুপরিচিত ভদ্কা। কালো বোতলগুলি প্রতি ডিশের পাশে সাজানো আছে কয়েকটি করে। খামারের কর্মকর্তারা শুভকামনা পর্ব সমাপ্ত করে আহারে মনোনিবেশ করলেন এবং আমাদের বিনীতভাবে বললেন, "বুঝতেইতো পারছেন, মরুভূমির মধ্যে খামার, তাই সামান্য একটু ব্যবস্থা করেছি—একটু জলযোগ করুন।" আহার কি করবো দর্শনেই শেষ, কোনক্রমে ডিশের 'পর বাচ্চা দেখে একটি রামপাখী তুলে নিয়ে তার দেহ থেকে আচড়ে আচড়ে, খুবলে খাবলে কিছু মাংস গলাধঃকরণ করলাম। বিপত্তি ঘটলো যখন আমি বললাম, গরু ও শুয়োরের মাংস খাইনা। তখন দু'তিনজন একসঙ্গে "হায় হায়" করে উঠে বললো, "তাহলে তো আপনাদের বড্ড্ কষ্ট হবে। যা হোক, আপনারা গোটা পাঁচেক করে মুরগী খেয়ে নিন।" আমাদের সঙ্গে এই কথা বলতে বলতে রুশ ভাষায় কি একটা কথা বললো, মানে বুঝলাম না, দেখলাম কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে কয়েক ডজন সিদ্ধ ডিম টেবিলে হাজির হ'ল, সেই সঙ্গে এলো আঙ্গুর, আপেল ও অন্য আরো কয়েক রকমের ফল। আহারের দ্রব্যসম্ভার

এবং আহার নিয়ে এমন সমস্যায় কখনও পড়িনি। আমাদের মনের কথা বুঝিয়ে বলবো, সে উপায় নেই। বিপরীত দিকে অতিথিরা কিছুই খাচ্ছেন না দেখে খামার কর্তাদের মনোকষ্টের সীমা নেই। কোনওক্রমে দোভাষীকে সবকিছু বুঝিয়ে রেহাই পেয়েছিলাম, তবে—বসে দেখতে হয়েছিল রুশীয় কৃষকদের আহার। ঘণ্টা দেড়েক ধরে আহারপর্ব যখন শেষ হ'ল, তখন দেখলাম কিছু কালো রুটি, কিছু ফল, আর কিছু মুরগীর হাড় ছাড়া পড়ে কিছু নেই। তবে সব সময় মনে যে কষ্ট তাঁরা পাচ্ছিলেন, সেটা প্রকাশও করছিলেন। ভাষা না বুঝলেও বুঝছিলাম, "আহা, আপনাদের বড়ো কষ্ট হলো, আপনারা কিছুই খেতে পারলেন না।"

খামার থেকে বেরিয়ে আমরা বৈরামআলিতে এসে কারাকুম-খালে লঞ্চে উঠলাম। আমাদের জন্যে আগে থাকতেই এই লঞ্চের ব্যবস্থা করা ছিল। আমাদের নিয়েই লঞ্চের যাত্রা শুরু হ'ল। লঞ্চ যখন চলতে আরম্ভ করলো তখন তার গতিবেগ দেখে মনে হ'ল, একে মোটরলঞ্চ না বলে জলপথের বিমান বলাই ভালো। ছোট্ট নদী, আমরা এগিয়ে চলেছি, দুপাশে হোগলা জাতীয় বন। কিছু কিছু বনের চেহারা খাগড়া গাছের মতো। মরুভূমির বুকচিরে এই নদী চলেছে।

কারাকুম খালটি সত্যিই একটি সারা ইউনিয়ন প্রকল্প। এটি মানুষের তৈরী একটি নদী। দেশের দুই শতাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠানে নির্মিত মাটি সরাবার যন্ত্রপাতি, উপুড় করতে সক্ষম লরি, সাজসরঞ্জাম ও অপরাপর জিনিসপত্রের একটি বিরাট সরঞ্জামের প্রতি প্রীতিভরা মন নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের ৩৬টি জাতির লোকেরা এখানকার নির্মাণস্থলে কাজ করছেন। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে খালটির ৮৩৭ কিলোমিটারেরও বেশী খনন করা হয়েছে। এর দ্বারা সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ত্রয়োবিংশতিতম

কংগ্রেসের নির্দেশাবলীতে পরিকল্পিত খালটির তৃতীয় অংশের খনন-কার্য সম্পন্ন হ'ল। নির্মাণকারীরা আপাতদৃষ্টিতে দুর্জয় মরুভূমির ওপর চতুর্থ অংশটির কাজে তাদের নতুন অভিযান শুরু করেছেন। এই নির্মাণস্থলটি সেয়োকতেপ গ্রাম পর্যন্ত একটি বিরাট অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত। এই সেয়োকতেপেই ২০ কোটি ঘনমিটারের বেশী জলধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন "কোপেতদাগ" মনুষ্যসৃস্ট-হ্রদ জলাধারটি রূপ পরিগ্রহ করেছে। কারাকুম খালটি বিশ্বের হাইড্রো-টেকনিক্যাল প্রকল্পগুলির মধ্যে অদ্বিতীয় এবং সর্বাধিক দূরত্বে, সবচেয়ে বেশী পরিমাণ জল বহনে এই খালটি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই খাল কারাকুম মরুভূমির ২ লক্ষ ২০ হাজার হেক্টর জমিতে জলসেচ সম্ভবপর করেছে। ১৯৭৫ সালে নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পরিসমাপ্ত হলে খালের দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে ১ হাজার ৪ শত কিলোমিটার এবং আমুদরিয়া থেকে প্রতি সেকেণ্ডে জল বের করার পরিমাণ ৫০০ ঘনমিটার ও সেচযুক্ত জমির পরিমাণ ৪ লক্ষ হেক্টরে দাঁড়াবে বলে আশা করা যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্বিংশতিতম কংগ্রেসের নির্দেশাবলী খালের চতুর্থ অংশের নির্মাণকারীদের সামনে রীতিমত উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য উপস্থিত করেছে। আরও পশ্চিমে নিয়ে গেলে আমুদরিয়ার' জল মরগার, তেজেন ও কোপেতদাগ অঞ্চলগুলিতে সেচব্যবস্থার উন্নতি সাধনে সাহায্য করবে এবং ১ লক্ষ ৬০ হাজার হেক্টর জমিতে মিহি আঁশের তুলা উৎপাদন করার নতুন সুযোগ খুলে দেবে। উপরন্তু শহর ও শিল্পকেন্দ্রগুলির জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাবে এবং সেগুলিকে ঘিরে কৃষির ভিত্তি তৈরি করবে। এইগুলি আবার শহরের জনসংখ্যার জন্য খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করবে এবং স্থানীয় শিল্পের জন্য আরও কাঁচামাল সরবরাহ

করবে। খালের চতুর্থ অংশের কাজ শেষ হলে শহরগুলিকে ঘিরে নতুন নতুন অবসর-বিনোদন কেন্দ্র ও ছুটি কাটানোর কেন্দ্র গড়ে উঠবে। আগামী কয়েক বছরে খাল থেকে বাৎসরিক গড় আয় হবে ২০ কোটি রুবল।

আজ কিন্তু কেন্দ্রীয়-গ্রাম গামি তার চারপাশের কৃষিক্ষেত্র নিয়ে আশখাবাদ শহরের জন্য তরিতরকারি ও তরমুজ ফলানোর এক প্রধান এলাকা হয়ে উঠেছে। এখানে প্রতি বছরে ১২ হাজার টন তরিতরকারি এবং ৩ হাজার টনের ওপর আখ ও তরমুজ উৎপন্ন হয়। রাষ্ট্রীয় খামারে ১৫০ হেক্টর জমিতে ফলের বাগান ও ৪০০ হেক্টর জমিতে আঙ্গুরের ক্ষেত রয়েছে। কারাকুম খাল বিরাট পরিমাণ তুর্কমেনীয় তুলা উৎপাদনে সাহায্য করে। তেজেন রাষ্ট্রীয় খামারের তুলা ক্রয়-কেন্দ্রটিতে একবার গেলেই এ কথা স্পষ্ট বোঝা যায়। গত বছর এই খামারের উৎপাদকেরা ১১ হাজার টন তুলা উৎপাদন করেন। এই খামারের চারপাশে বিস্তীর্ণ বালুকারাশি ছিল শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তৃষিত, সেই বালিতে কারাকুম খাল জল এনে দিয়েছে বলেই এই তুলা উৎপাদন সম্ভবপর হয়েছে। তুর্কমেনীয় প্রবাদ—"জল থেকে ফল হয়, জমি থেকে নয়"—এ ক্ষেত্রে বাস্তবে পরিণত হয়েছে। কারাকুম খাল এবং তার দ্বারা জলসেচের যে বিস্তীর্ণ ব্যবস্থা সম্ভবপর হয়েছে তার জন্যই তুর্কমেনীয় তুলা উৎপাদকেরা বিগত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার উপর আরও ৫০ লক্ষ টন তুলা উৎপাদনে সক্ষম হয়েছেন। এই প্রজাতন্ত্রের মোট তুলা উৎপাদনের ৪০ শতাংশ উৎপন্ন হয় কারাকুম খালের তীরবর্তী অঞ্চলে। দানা শস্য, তরিতরকারি ও তরমুজের ফলন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, উপরন্তু লক্ষাধিক পশুচারণভূমিও সেচসিঞ্চিত হয়েছে।

লঞ্চের মধ্যে বসে একখানা বিরাট মানচিত্রের মাধ্যমে কারাকুম

খালের ইতিবৃত্ত আমাদের বোঝাচ্ছিলেন, খাল-খননের কর্মকর্তারা। একটা খাল—তাকে ঘিরে মানুষের মনে কত আশা আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হতে পারে তার ছবি ফুটে উঠছিল এই খাল-খনন কার্যের কর্মকর্তাদের চোখেমুখে। সব শুনে সবশেষে প্রশ্ন করলাম, আপনাদের এই খালে মাছ পাওয়া যায় তো? কর্মকর্তারা বললেন, খুব সুন্দর সুস্বাদু মাছ পাওয়া যায়। তিরিশ-পঁয়ত্রিশ কিলো পর্যন্ত ওজন হয় সেই মাছের। নদীর ধারে যে সব উদ্ভিদ দেখছেন এগুলি উৎপাদন করা হয়েছে মাছের খাদ্যের জন্যেই। আমরা কারাকুম খাল দেখে আশখাবাদ ফিরলাম। আশখাবাদ থেকে আবার মস্কো। আশখাবাদেই শুনলাম আশখাবাদের অনেক খ্যাতি আছে। তার সঙ্গে অতিরিক্ত খ্যাতি হ'ল আশখাবাদের রেস্। আশখাবাদেই একমাত্র ঘোড়দৌড় বা রেস্ চালু আছে।

আবার মস্কো। এবার আমাদের বাসস্থান হোটেল পিকিং-এর সাত তলায়। হোটেল পিকিং-এ আগে একবার এসে নাস্তা খেয়ে গিয়েছিলাম; এবার কয়েকদিনের জন্যে পাকাপাকি বাস। সন্ধ্যায় আমন্ত্রণ পেলাম বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সামসুর রহমানের কাছ থেকে। সামসুর রহমান সাহেব বাংলাদেশের একজন নামকরা সি. এস. পি. অফিসার ছিলেন। আমার সঙ্গে যদিও ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না, কিন্তু আমার "আমি মুজিব বলছি" গ্রন্থে রহমান সাহেবের যথেষ্ট উল্লেখ আছে। সামসুর রহমান সাহের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দু'নম্বর আসামী ছিলেন; এক নম্বর আসামী ছিলেন স্বয়ং মুজিব। বাংলাদেশ রাষ্ট্রদূতের গাড়ি এসে সন্ধ্যার মুখেই আমাদের দুজনকে সামসুর রহমান সাহেবের বাসায় নিয়ে গেল। গেটের গোড়া থেকেই দুজন বঙ্গবাসীকে একজন বঙ্গবাসী

মাতৃভাষায় সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বসবার ঘরে নিয়ে বসালেন। ঘরে বসতেই সর্বপ্রথম যা নজরে পড়লো, তা হ'ল—কয়েকটা টব, সেই টবে লঙ্কা গাছ এবং গাছে বেশ কয়েকটি লঙ্কা ঝুলছে। লঙ্কা গাছ দেখে হো হো করে হেসে উঠলাম। ধানি লঙ্কা, তোমার কি সৌভাগ্য, কত হাজার মাইল পেরিয়ে মস্কো শহরে এসে সুদৃশ্য টবে স্থান পেয়েছো! সামসুর রহমান সাহেব বললেন, দেখুন, লঙ্কা খাওয়া বড় কথা নয়, টেবিলে বসে খেতে খেতে এই লঙ্কা এবং লঙ্কাগাছ দেখলেও শান্তি। শুরু হ'ল গল্প। প্রথমে দেশের তারপর পৌঁছলাম মূল জায়গায় অর্থাৎ সেই সাখারভ-সোলঝে-নিৎসিন প্রসঙ্গে। আমরা বললাম, আপনি তো আমাদের খাঁটি দেশী লোক। নির্ভেজাল বাঙ্গালী এবং কমিউনিস্টও নন—এই সোলঝেনিৎসিন ব্যাপারটা আমাদের একটু বুঝিয়ে বলুন। আমরা বললাম, ঘুরলাম অনেক দেশ, অনেকের সঙ্গেই সোলঝেনিৎসিন প্রসঙ্গ নিয়ে কথাও হ'ল; কিন্তু ব্যাপারটা আমাদের কাছে ক্রমেই গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সামসুর রহমান সাহেব সেই দিন রাত্রে প্রায় ঘণ্টা চারেক ধরে আমাদের সঙ্গে আলোচনাকালে যে সব তথ্য তুলে ধরেছিলেন, তাতে রাশিয়া এবং সোলঝেনিৎসিন সম্পর্কে অনেকটা ধোঁয়া পরিষ্কার হয়ে গেছে। অবশ্য এটা আমার কথা। আমার সঙ্গী প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীশঙ্কর ঘোষের কথা কি না জানি না। এই একই প্রসঙ্গে আরো একজন বাঙ্গালী, ভারতের প্রবীণ বিপ্লবী শ্রীগোপেন চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা হয়েছিল। শ্রীগোপেন চক্রবর্তী বহু বৎসর মস্কোতে আছেন এবং মস্কোর নাগরিক বললেও চলে। একদা ভারত থেকে জেল-ফাঁসী-দ্বীপান্তর অগ্রাহ্য করে যেসব বিপ্লবী জার্মান ও রুশদেশে আশ্রয় নিয়ে প্রবাসে থেকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন, শ্রীচক্রবর্তী ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তবে এক্ষেত্রে

শ্রীচক্রবর্তীর কথা ও ব্যাখ্যাকে কাউকে মেনে নিতে না বলাই ভাল, কারণ তাঁরা বলবেন, মগজ ধোলাই হয়েই শ্রীচক্রবর্তীর মগজে নিরপেক্ষতা বলে কিছু নেই। কিন্তু সামসুর রহমান সম্পর্কে নিশ্চয়ই সে কথা বলা যাবে না। যাহোক, সেদিন সামসুর রহমান সাহেবের কাছ থেকে ও পরে শ্রীগোপেন চক্রবর্তীর কাছ থেকে অর্থাৎ প্রবাসী দুজন বাঙ্গালী, যাঁর একজন হলেন আই. সি. এস. মার্কা কট্টর ব্যুরোক্র্যাট; আর একজন হলেন প্রবীণ বিপ্লবী— যা শুনেছিলাম, সেটা তুলে ধরছি। রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হবার পর গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটে গেছে, সেই পরিবর্তনের চিত্র এবং সেই পরিবর্তনের পটভূমিকায় সাখরভ-সোলঝেনিৎসিন প্রভৃতি প্রসঙ্গগুলি বুঝবার চেষ্টা করলে অনেক ঘটনাই খুব সহজ ও সরল হয়ে যায়। অবশ্য সেই বোঝাকে যদি আবার "মগজ ধোলাই হয়ে গেছে"—এই কথা বলে উড়িয়ে দেওয়া না হয়। সামসুর রহমান সাহেব ও শ্রীচক্রবর্তী আলাদা আলাদা ভাবে দুজনে যা বলেছিলেন এবং তাঁদের বক্তব্য থেকে আমি যা বুঝেছিলাম সেটাই তুলে ধরছি।

রুশ বিপ্লব ও বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার পর সেই রাষ্ট্রকে শিশু অবস্থায় আহত বা নিহত করবার বিশ্বব্যাপী চক্রান্ত প্রতিরোধে রাশিয়াকে কঠিন লৌহ বেষ্টনিতে ঘিরে রাখা হয়েছিল। এমন ভাবে ঘিরে রাখা হয়েছিল, যাতে বাইরের শুধু শত্রুশ্রেণীর মানুষ নয়, বিষাক্ত কোনও হাওয়াও যাতে প্রবেশ করে শিশুর ক্ষতি করতে না পারে। সেই শিশুর বয়স পঞ্চাশ অতিক্রান্ত। সেই শিশুও আজ বিশ্বে একক নয়; ইতিমধ্যে আরো অনেক ভাই-ব্রাদার জন্মগ্রহণ করেছে, ফলে একদা যে লৌহপ্রাচীর গড়ে শিশুকে লালন-পালন ও সুস্থ-সবল করবার প্রয়োজনীয়তা ছিল, সেই প্রয়োজনীয়তা অনেক কমেছে। তাই এক কথায় বলতে

গেলে পঞ্চাশ বছর আগের রাশিয়া, তার জীবনযাত্রা, তার রাজনীতি, তার ভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক—সব কিছুরই পরিবর্তন হয়েছে। এই লৌহপ্রাচীর ভালো ছিল কি মন্দ ছিল সে সম্পর্ক নানা মুনির নানা মত থাকতে পারে, কিন্তু লেনিন, স্তালিন ও ক্রুশ্চেভ্ আমল পেরিয়ে রাশিয়া আজ লৌহ-প্রাচীরের অন্তরালে একটি মহাদেশ নয়; আজ রাশিয়ার দরজা সবদিক দিয়ে খোলা। "দিবে আর নিবে, মিলাবে মিশিবে, যাবে না ফিরে" সবদিকে অর্গলমুক্ত রাশিয়াতে আজ বড় কেউ ফিরে যায় না; বরং বলা যায়, সকলের উদ্দেশেই রুশদেশ সুস্বাগতম জানায়। তাই রুশ মহাদেশের যে কোন প্রান্তেই যাওয়া যাক না কেন, দেখা যাবে—শত শত ট্যুরিস্ট ঘুরে বেড়াচ্ছেন; শুধু ঘুরে বেড়ানো নয়, ট্যুরিস্টদের জন্যে সরকারী ব্যবস্থাও অন্য যে কোন পুঁজিবাদী রাষ্ট্র অপেক্ষা খারাপ নয়। মূলকথা, দীর্ঘদিনের নানা বন্ধুর পথ অতিক্রম করে রাশিয়া আজ আদর্শে অটুট, কিন্তু রাজনীতিতে অনেক বেশী উদারপন্থী ও সহনশীল হয়েছে। এই সহনশীলতা শুধু আভ্যন্তরীণ জীবনে নয়, বৈষয়িক ও রাষ্ট্রীয় জীবনেও সম্প্রসারিত। অবশ্য সোভিয়েত রাশিয়া রাষ্ট্রীয় নীতিতে সহাবস্থান ও শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রের উত্তরণকে দর্শন হিসাবে গ্রহণ করায় ব্যাপারটা আরো সহজ হয়েছে। বৈষয়িক ক্ষেত্রে যেমন বলা যায়, কয়েক বছর আগেও যে-কোন বিদেশীমুদ্রা সোভিয়েত ইউনিয়নে ছিল অচল। কিন্তু এখন মার্কিন ডলার, ব্রিটিশ স্টার্লিং, জার্মান মার্ক এমনকি আমাদের ভারতীয় মুদ্রাও রাশিয়াতে অচল নয়। কয়েক বছর আগেও রাশিয়াতে বিদেশী পুঁজি আমদানি অথবা বিদেশী পুঁজি নিয়োগ ছিল কল্পনার অতীত। কিন্তু আজ আমেরিকান বা জার্মান যে-কোন পুঁজি রাশিয়াতে সীমাবদ্ধ আকারে হলেও নিয়োজিত হচ্ছে। সাইবেরিয়ার গ্যাস আমেরিকায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আমেরিকান পুঁজি, বছরে ছ'লক্ষ গাড়ি নির্মাণের জন্যে ফিয়েট

কোম্পানিকে কারখানা করতে দিয়ে জার্মান পুঁজি, বাকু থেকে তেল সরবরাহের উদ্দেশ্যে জাপান পর্যন্ত পাইপলাইন বসাতে জাপানী পুঁজি নিয়োজিত হচ্ছে। এই যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বা পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে উদার মনোভাব, তারই একটি দিক হ'ল দেশের অভ্যন্তরে নানামত ও চিন্তার প্রতি সহনশীলতা। এই সহনশীলতা লেনিন-যুগ, স্তালিন-যুগ, ক্রুশ্চেভ্-যুগ ও ব্রেজনেভ যুগে চারটি স্তর অতিক্রম করে এসেছে। একটা যুগ ছিল, যখন সমালোচনার অর্থ ছিল মৃত্যু। সরকার-বিরোধী বা পার্টি-বিরোধী ব্যক্তির সন্ধান পেলেই তাকে কোতল করা হ'ত। দ্বিতীয় স্তরে ছিল সমালোচক বা বিরোধীদের প্রাণে না মেরে বেশীর ভাগকে নির্জন নির্বাসন ও বন্দী শিবিরে রাখা হ'ত। তৃতীয় স্তরে সমালোচক বা বিরুদ্ধবাদীদের আর নির্জন বন্দী শিবিরে নয়, সমাজ থেকে বের করে দেওয়া হ'ত। আমলটা হ'ল চতুর্থ স্তরের শেষ যুগ, যেখানে সমালোচক বা বিরুদ্ধবাদীদের সামাজিক বয়কট নয়, বা তাদের গতিবিধি চিন্তাভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করা নয়, তাদের শুধু অবজ্ঞা করা বা তাদের প্রতি কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ না করা। এই স্তরেতে, অর্থাৎ যে স্তরে বিরুদ্ধবাদী বা সমালোচকদের অবজ্ঞা করা হচ্ছিলো, একই সঙ্গে বিরুদ্ধবাদীরাও বেশ কিছুটা স্বাধীনভাবে তাদের মতামত প্রকাশ করতে পেরেছিলেন, তাদের ভিন্ন-মতকে প্রচারের সুযোগও পাচ্ছিলেন। এই স্তরান্তর কালপঞ্জীর একটি জায়গাতে আবির্ভাব ঘটলো বুদ্ধিজীবীদের, যেখানে বুদ্ধিজীবীরা বেশ কিছুটা স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ ও ভিন্ন-মত প্রচারের সুযোগ পেলেন। সামসুর রহমান সাহেব এই প্রসঙ্গে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করলেন। যেমন, মস্কোর কাগজে এমন খবরও এখন প্রকাশিত হয়, যে-খবর হ'ল সি. পি. এস. ইউ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় একজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা হয়েছে,

অথচ এই মন্ত্রী মহাশয়কে এখনও পদচ্যুত করা হয়নি অর্থাৎ কাগজে কেন্দ্রীয় কমিটিতে মন্ত্রীর সমালোচনা এবং তাঁকে কেন পদচ্যুত করা হয়নি, এই জাতীয় সংবাদপ্রকাশ অনেকেরই কল্পনার বাইরে। এই স্বাধীন মতামত প্রকাশ ও রাষ্ট্রের সহনশীলতা যখন একটা নতুন স্তরে উন্নীত হবার দিকে অগ্রসর হচ্ছে, ঠিক তখনই শুরু হ'ল সাখারভ-সোলঝেনিৎসিন প্রসঙ্গ। সাখারভ ও সোলঝেনিৎসিন তাঁদের বক্তব্য এবং বিবৃতি দেশের বাইরে পাঠাবার সুযোগ পেলেন, বিদেশী সাংবাদিকরা সোলঝেনিৎসিনের কাছে যাতায়াতের অবাধ সুযোগ পেল অর্থাৎ যে কথাটা চালু ছিল সোভিয়েত রাশিয়ায় বাক-স্বাধীনতা ও স্বাধীন মতামত প্রকাশের অবাধ সুযোগ নেই, সেই কাল অতিক্রমণের মুখে। একটা মুক্ত মতামত বিনিময় ও অবাধ মেলামেশার সুযোগ বৃদ্ধি পেতে লাগলো। একটা চক্র, যারা রাশিয়ার এই মুক্ত পরিবেশকে বিপদ-স্বরূপ মনে করলো, তারাই এগিয়ে এলো সোলঝেৎসিনকে ব্যবহার করতে। সোলঝেনিৎসিনকে তারা এমনভাবে ব্যবহার করলো, যাতে—রুশ সরকার বাধ্য হয় তার এই সহনশীল ও উদারনীতি পরিবর্তনে। কারণ, সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদীরা রাশিয়া সম্পর্কে যেসব অপপ্রচার দিয়ে রাশিয়ার চিন্তা-ভাবনা, তার অগ্রগতি, সব কিছু থেকে নিজের দেশের মানুষকে আড়াল করে রাখে, সেই আড়াল করে রাখার প্রাচীরটাও ভাঙতে শুরু করেছিল। এখন লক্ষ লক্ষ অ-রুশীয়, সে মার্কিন, জার্মান, ব্রিটিশ যেই হোক না কেন, রাশিয়ায় আসছে, অবাধে রুশ দেশ ভ্রমণ করছে, রুশ দেশের সব কিছু দেখে বুঝে যাচ্ছে—এটা অনেক দেশের কাছেই বিপদের। রুশ দেশ সম্পর্কে প্রচলিত ধ্যান-ধারণা ও প্রচারগুলি ক্রমেই সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে জোলো হয়ে যাচ্ছিল। একদা লেনিন-যুগে প্রচার ছিল, খোদ লেনিন সাহেব প্রতিদিন সকালে

স্নান করেন জলের বদলে রক্তে। অনেকগুলি শিশুর মুণ্ড কেটে তাদের রক্ত দিয়ে লেনিন সাহেবের বাথটব ভরা হয়। এই প্রচার যারা শুনে এসেছে (এবং এটা কাগজেও ছাপা হয়েছিল), পড়ে এসেছে—তাদের চোখ খুলে যাচ্ছিল। এটা বন্ধ করবার প্রচণ্ড চাহিদা অনুভব করছিল নানা চক্র। এই চক্র নিক্সন সাহেবের সঙ্গে ব্রেজনেভের মেলামেশাও ভালো চোখে দেখছিল না। রুশ দেশের মধ্যেও অবশ্য কিছু লোক এই নরম ও উদারনীতির বিরোধী ছিলেন না, এমন নয়। পিওতর সেলেস্ত, ইউক্রেন কমিউনিস্ট পার্টির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক এবং সি. পি. এস. ইউ পলিটব্যুরোর সদস্য সম্প্রতি পদচ্যুত হয়েছেন। অনেকর ধারণা, ব্রেজনেভের উদারপন্থী নীতির বিরোধিতা করতে গিয়ে তাকে অসময়ে চলে যেতে হয়েছে। যা হোক মূল কথা হ'ল—রাশিয়া সম্পর্কে যে বিশ্বব্যাপী অপপ্রচার আছে এবং রাশিয়ার প্রভাব থেকে নিজের দেশকে আড়াল করে রাখবার যে প্রচেষ্টা সাম্রাজ্যবাদী, উপনিবেশবাদী ও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের আছে, তারাই সোলঝেনিৎসিনকে আড়কাঠি হিসাবে ব্যবহার করেছে। সেই দিন রাত্রে সামসুর রহমান সাহেবের কাছ থেকে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে অর্জিত জ্ঞানের যে ভাগ আমরা পেয়েছিলাম, সেটা আমাদের মনকে খুবই প্রভাবিত করেছিল। যার কারণে পরবর্তীকালে আমরা আর অন্য কারো সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সময় সোলঝেনিৎসিন-প্রসঙ্গ তুলিনি বললেই চলে।

২৩শে নভেম্বর দুপুরে মস্কোর প্রাচ্য বিদ্যানুশীলন ইনস্টিট্যুটের বাড়িতে প্রবেশ করে ভারত সংক্রান্ত বিভাগটি দেখে অবাক না হয়ে পারিনি। সুবিশাল বাড়ি, অজস্র ঘর আর সব ঘরে চলেছে ভারত-সংক্রান্ত গবেষণা। এই গবেষকদের জালে ধরা পড়ছে প্রতিটি ঘটনা। প্রাচ্য বিদ্যানুশীলন ইনস্টিট্যুটের বাড়িতে যে মানুষগুলি আসা-যাওয়া করছেন, তাঁদের দেখেই বোঝা যায় তাঁরা বুদ্ধিজীবী

বা অধ্যাপক হবেন। আমাদের দু'জনের সঙ্গে বৈঠক হবে প্রাচ্য বিদ্যানুশীলন ইনষ্টিট্যুটের অ্যাকাডেমিশিয়ানদের। এই বাড়িতে প্রবেশের আগেই আমাদের দোভাষী আমাদের বললেন, এইখানে আলোচলনাকালে আপনারা যে-কোন প্রশ্ন করতে পারেন এবং কোন প্রকার সঙ্কোচের কারণ নেই। ছোট একটি ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন ইনষ্টিট্যুটের পরিচালক, সঙ্গে আরো কয়েকজন। ঘরে প্রবেশ করে দেখলাম একখানা টেবিলের দুইপাশে চেয়ার সাজানো; টেবিলে নোট নেবার কাগজ-পেনসিল প্রস্তুত। পরিচয় আদান-প্রদানের পর আরম্ভ হ'ল প্রশ্নোত্তর। আমরা দু'জন ঘণ্টা তিনেক প্রশ্ন করার পর পাঁচজন অ্যাকাডেমিশিয়ান আমাদের প্রশ্ন করলেন। এই প্রশ্নোত্তরকালে আমরা দেখলাম, এঁরা ভারত সম্পর্কে এমনকি পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে জানেন না এমন তথ্য নেই। বৃহৎ রাজনৈতিক ঘটনাতো বটেই অতি নগণ্য রাজনৈতিক দলাদলি থেকে শুরু করে সংঘর্ষ—সব খবর তাদের জানা। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়, অবসর গ্রহণকারী শ্রী অতুল্য ঘোষ, প্রদেশ কংগ্রেস থেকে ছাত্র পরিষদ, সি. পি. আই, সি. পি. আই. এম. সহ সকলের ঠিকুজী-কুলজী এঁদের নখদর্পণে। আলোচনার দ্বিতীয় পর্বে ছিল আমাদের প্রশ্ন করা ও ওঁদের উত্তর দেবার পালা। প্রথমেই প্রশ্ন করলাম: ভারতবর্ষের সি. পি. আই. এম. দল সম্পর্কে রুশ নেতাদের চিন্তাভাবনা কি? প্রশ্নোত্তরের আগেই একটা কথা পাকা হয়েছিল—প্রশ্নোত্তরে দু'পক্ষের যাঁরাই যে-কথা বলি না কেন, সেটা ব্যক্তিগত অভিমত বলে ধরে নেওয়া হবে। কারোর কোন কথাই কোন সরকার বা দলের সরকারী বক্তব্য বলে মনে করা হবেনা। তাই যে-কোন প্রশ্ন আলোচনাকালেই একদিকে যেমন আমরা দু'জন আমাদের কথা বলছিলাম, নিজেদের চিন্তা-ভাবনা ও জ্ঞানমত রুশ অ্যাকাডে-

মিশিয়ানরাও কোন কোন ক্ষেত্রে একই বিষয়ে পাঁচজনই বলছিলেন। এখানে আরো একটি কথা উল্লেখ করে রাখা ভাল, যে-পাঁচজনের সঙ্গে আমাদের কথা হচ্ছিল, এঁরা শুধু ডক্টরেট, তাই নয়, এর মধ্যে একজন ছিলেন, যিনি—সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সদস্য—অপরজন দীর্ঘদিন ভারতের সোভিয়েত দূতাবাসের কর্মকর্তা ছিলেন। এই পাঁচজন হলেন, ইনস্টিট্যুটের ভারতীয় বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ কতোভস্কি, ভারতীয় বিভাগের বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত শাখার প্রধান ডঃ দানিলভ, ভারতীয় বিভাগের ইতিহাস শাখার প্রধান ডঃ কোমারভ, ভারতীয় বিভাগের গবেষক ডঃ চিচেরভ এবং ডঃ কোলিরালোভা। অন্যত্র তো বটেই—এই পাঁচজনের সঙ্গে আলোচনাকালে আমরা আরো বেশী করে বুঝলাম, কি অসাধারণ গুরুত্ব ওঁরা দিচ্ছেন মিঃ ব্রেজনেভের এই ভারত সফরকে। ওঁদের গুরুত্বের প্রধান কথা হ'ল এশিয়ার যৌথ নিরাপত্তা সম্পর্কে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও মিঃ ব্রেজনেভ এবার দিল্লী-আলোচনায় নিশ্চিতভাবে একটি সুস্পষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং সেটা হবে গ্যারান্টির স্বরূপ। এই বিশেষজ্ঞরা বললেন, এশিয়ার যৌথ-নিরাপত্তার চিন্তাধারা কোন নতুন কিছু নয়, প্রকৃতপক্ষে ভারতের সুমহান নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু এই চিন্তাধারার জনক। এশিয়ার যৌথ-নিরাপত্তা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ যা করবার করবে এশিয়ারই জনগণ। কিন্তু যেহেতু ভারত বিশ্বশান্তির জন্য অবিরাম সংগ্রাম করছে, সেহেতু ভারতই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করবে—এটাই বিশেষজ্ঞদের আশা। দীর্ঘ চারঘণ্টা ব্যাপী বৈঠকে প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দিয়ে যে চিন্তাভাবনার মর্মকথা বোঝা গেল, তা হ'ল এই—পৃথিবীর মোট ভূখণ্ডের তিরিশ শতাংশ এশিয়ায় অবস্থিত। এবং মোট জনসমষ্টির ৫৫ শতাংশ বাস করে এশিয়ায়। কাজেই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির গতি-প্রকৃতি নির্ণয়ে এশিয়ার ভূমিকা

সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। যুদ্ধোত্তরকালে যত বেশী নাটকীয় ঘটনা ও সামাজিক, রাজনৈতিক পরিবর্তন এশিয়া ভূখণ্ডে দেখা গেছে, এমনটি আর পৃথিবীর কোন অঞ্চলে দেখা যায়নি। সামরিক ও রাজনৈতিক জোটস্থাপনে এশিয়া-ভূখণ্ডের রাষ্ট্রগুলি সবচেয়ে বেশী জড়িয়ে পড়েছে। অনেকগুলি নোংরা ও বর্বর যুদ্ধের ঝটিকা বয়ে গেছে এশিয়া ভূ-খণ্ডের ওপর। কিন্তু এই মুহূর্তে এশিয়া ভূখণ্ডে একটা শান্তির পরিবেশ চলছে। কাজেই এই পরিবেশকে দীর্ঘস্থায়ী করা এবং ভবিষ্যত যে-কোন আগ্রাসী যুদ্ধ থেকে এশিয়া ভূ-খণ্ডের রাষ্ট্রগুলিকে দূরে রাখা যৌথ-নিরাপত্তা চুক্তির অন্যতম মর্মার্থ। এশিয়া নিরাপত্তা চুক্তির অন্তর্ভুক্ত সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে স্বাভাবিক রাজনৈতিক সম্পর্ক, ব্যাপক অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সহযোগিতা বিদ্যমান থাকবে। সকল রাষ্ট্র একে অপরের সার্বভৌমত্বকে মর্যাদা দেবে। যে-কোন বিরোধের মীমাংসা করবে—আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে।

আমরা প্রশ্ন করেছিলাম, 'চীন মনে করছে—এই চুক্তি তাকে ঘিরে ফেলবার।' বিশেষজ্ঞরা বললেন, আমাদের নেতা কমরেড ব্রেজনেভ এ-কথার জবাব আগেই দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, চীন নিশ্চিতভাবে এই চুক্তির শরিক হবে। চীনের এই চুক্তির শরিক হওয়ার অর্থ বিশ্বশান্তির একটা গ্যারান্টি। বিশেষজ্ঞরা বললেন, রাশিয়া মনে করে এই চুক্তি চীনকে এশিয়ার অন্য সব রাষ্ট্রের সঙ্গে এক পরিবার-ভুক্ত করার সহায়ক হবে। চীনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বা চীনকে কোণঠাসা করতে এ-চুক্তি নয়। আমরা মনে করি চীন এক-পরিবারভুক্ত হলে যে-সকল আভ্যন্তরীণ বিরোধ ও মন কষাকষি যাচ্ছে সেগুলো খুব তাড়াতাড়ি মিটে যাবে। আমরা জানি, ভারত চীনের সঙ্গে সব বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে চায়। এই সঙ্গে একথাও

জানি, চীনে যা চলছে, তা চিরকাল চলবে না—চীনকেও বাস্তবমুখী হতে হবে। মোটকথা সোভিয়েত এই চুক্তি নিয়ে নিজের কোন গ্রুপ করতে চায়না এবং এই চুক্তি কারও ওপর চাপিয়েও দিতে চায়না।

কংগ্রেস ও শ্রীমতী গান্ধী সম্পর্কে সোভিয়েত চিন্তা-ভাবনার সবচেয়ে বেশী প্রতিফলন দেখা যায় ডঃ জে. কতোভস্কির কথার মধ্যে। ডঃ কতোভস্কি প্রাচ্যবিদ্যা অনুশীলন ভবনের ভারত-সংক্রান্ত বিভাগের প্রধান। আমি যে প্রশ্নটা সোভিয়েত বিশেষজ্ঞের সামনে রেখেছিলাম, সেটি মূলতঃ রেখেছিলাম ভারতবর্ষে সি. পি. আই. দলের কংগ্রেস সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা ও কিছুটা রাজনৈতিক কর্ম-সূচীর প্রেক্ষাপটে। সম্প্রতি বেশ কিছুদিন সি. পি. আই. নানাভাবে এই কথাটা বলছে যে, কংগ্রেস তার ঘোষিত নীতি ও কর্মসূচী থেকে পিছু হঠছে। সি. পি. আই-এর এই মূল্যায়ন সম্পর্কেই সোভিয়েত বিশেষজ্ঞদের মনোভাব বুঝবার চেষ্টা করে প্রশ্নটা সেইভাবে রাখলাম। ডঃ কতোভস্কি এ-সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তব্য রাখলেন—তাঁকে সহায়তা করলেন ডঃ ভি. আই. দানিলভ; ডঃ দানিলভ বৈদেশিক নীতি বিভাগের প্রধান। ডঃ কতোভস্কি বললেন, কংগ্রেসের অভ্যন্তরে একটা শক্তিশালী প্রগতিবাদী অংশ গড়ে উঠছে এবং সেই প্রগতিবাদী অংশের নেত্রী হলেন ইন্দিরা গান্ধী। কাজেই কংগ্রেস সম্পর্কে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই প্রগতিবাদী অংশের ভূমিকা ও শক্তি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার। কংগ্রেস আজ ঠিক যেভাবে আছে এভাবে দীর্ঘদিন থাকবে না। বর্তমান রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ অক্ষুন্ন থাকলে কংগ্রেসের মধ্যে আভ্যন্তরীণ নীতিগত সংঘর্ষ তীব্র আকার ধারণ করবে। সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা

এই আলোচনায় সোজাসুজি না বললেও অনেক কথার মধ্যে যা বললেন, তা শুনে এ-কথা মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, এই বিশেষজ্ঞরা কংগ্রেসের মধ্যে আর একবার ভাঙনের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেন না। যা হউক, ডঃ কতোভস্কি বললেন, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর ঘোষিত নীতি ও কর্মসূচী থেকে সরে গেছেন বা পিছু হঠেছেন—একথা মনে করবার কারণ নেই। যে নীতি ও কর্মসূচীকে ভিত্তি কংগ্রেসে ভাগ হয়েছিল সেই মূল ধারাতেই শ্রীমতী গান্ধী চলেছেন। তবে, ষ্ট্রাটিজি, ট্যাক্‌টিস্‌ অর্থাৎ নীতি ও কৌশল সর্বদাই একরকম থাকবে এমন নয়। এ-ব্যাপারে আগু-পিছুর প্রশ্ন থাকতে পারে। কৌশলের কারণে কখনও জোরে, কখনও আস্তে চলতে হয়। এই আস্তে চলাকে পিছু হঠা অথবা নীতি পরিবর্তন ধরে নেওয়া ঠিক নয়। নীতি রূপায়ণে ধৈর্য ও সময়ের প্রয়োজন। আলোচনা চলাকালে এক সময় আমরা চলে এলাম পশ্চিমবঙ্গের প্রসংগে। যেহেতু আমরা দুজন সাংবাদিকই পশ্চিমবঙ্গের, সেইহেতু বিশেষজ্ঞদের পশ্চিম-বঙ্গের পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু জানতে ও বুঝতে উৎসাহী হয়ে প্রশ্ন করলাম। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি সম্পর্কেও এই বিশেষজ্ঞরা আমাদের চেয়ে খুব কম কিছু জানেন না। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস বেশ এখন ঢিলেঢালা সংগঠন, কেন এই সংগঠন শক্ত ও মজবুত হাতে নিয়ন্ত্রিত হয় না—এসব কথা তাঁদের অজানা নয়। এই প্রসংগে যে রাজনৈতিক নেতার নাম আমরা অনেকে ভুলে গেছি বা উল্লেখের পর্যায়ে আসেনা—সেই অতুল্য ঘোষের উল্লেখও তাঁরা করলেন। দেখলাম কংগ্রেসে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং ছাত্র-যুবকদের মধ্যে অনেকে প্রতিটি পর্যায়েই এই বিশেষজ্ঞদের অনুশীলনাধীন। তাই কিছুদিন আগে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কক্ষে কংগ্রেস-অনুগামী ছাত্র-যুবকদের সংঘর্ষ এবং

কংগ্রেস অনুগামী ছাত্রদের হাতেই কংগ্রেস-অনুগামী ছাত্র-নেতার খুনের ঘটনাটি সম্পর্কে তাঁরা ওয়াকিবহাল। এরপর প্রশ্ন এলো, রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান সরকার সম্পর্কে। শ্রী রায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ছেড়ে পশ্চিমবঙ্গের নেতৃত্ব নিতে কেন এগিয়ে এলেন, এ-সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরা বেশ কৌতূহলী। আলোচনা-বৈঠকে আমি ১৯৬৭ সাল থেকে রাজ্যের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং কি কি কারণে শ্রীরায় রাজ্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছেন, তা আমার সীমিত জ্ঞান মতো বুঝিয়ে বললাম। এবং আমার কথা শেষ করেছিলাম—সেদিনও রাজ্যে নেতৃত্ব নিয়ে রাজ্য পরিচালনার যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন শ্রীরায়, আজও কংগ্রেসের মধ্যে যে পরিস্থিতি, তাতেও শ্রীরায়ের বিকল্প নেই।

যে প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা শুরু হ'ল, সেই প্রশ্ন নিয়েই আলোচনা শেষ হ'ল। কারণ প্রশ্নটা সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল ছিল খুব বেশী। প্রশ্নটা হ'ল, ভারতের সি. পি. আই (এম). দল সম্পর্কে সোভিয়েত রাশিয়ার মনোভাব কি? এবং সি. পি. আই (এম) দলের কর্মসূচী সম্পর্কেই বা তাঁরা কি চিন্তা-ভাবনা করেন? সি. পি. আই (এম) সম্পর্কে আলোচনায় অংশ নিয়ে বিশেষজ্ঞরা বললেন, তাঁরা সি. পি. আই (এম) দলের কর্মসূচী কর্মধারা সম্পর্কে বরাবরই নজর রেখে আসছেন। তাঁদের ধারণা, যে একটা একরোখা মনোভাব নিয়ে সি. পি. আই (এম) দল গড়ে উঠেছিল, সেখানে একটা পরিবর্তনের প্রক্রিয়া (প্রোসেস) শুরু হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় সি. পি. আই ও সি. পি. আই (এম) দল অনেক কাছাকাছি আসবে। প্রত্যক্ষ ভাবে না হলেও দুই দলের গণ-সংগঠনগুলির ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করবার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। সি. পি. আই (এম) দলের কৃষক-সভার সদ্য অনুষ্ঠিত সম্মেলন, যা পাঞ্জাবের ভাতিন্দা শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে

সি. পি. আই দলনেতা শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতি এবং এবং শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙারের তাঁকে জড়িয়ে ধরা এবং সম্বর্ধনা—সব ঘটনাগুলিই উল্লেখ করলেন বিশেষজ্ঞরা। বিশেষজ্ঞেরা বললেন, সি. পি. আই ও সি. পি. আই (এম) একে অপরের সহযোগী হবে এবং ভবিষ্যতে যুক্তফ্রন্টও গঠন করবে। যুক্তফ্রন্টের অর্থ এই কখনও নয় যে, সেই যুক্তফ্রন্ট হবে অন্ধ কংগ্রেস-বিরোধী কর্মসূচী ভিত্তিক, বরং এই যুক্তফ্রন্ট কংগ্রেসকে তার ঘোষিত কর্মসূচী রূপায়ণে চাপ সৃষ্টি করবে। যুক্তফ্রন্ট মানে কংগ্রেস-বিরোধিতা—এ ধারণা ভুল। বামপন্থীরা কোনও মহাজোট গঠনে অগ্রসর হবে না, বরং মহাজোটের শরিক দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধেই যুক্তফ্রন্ট করে লড়াই করবে। ১৯৬৭ সালে অনুরূপ খেয়াল-খুশী মতো যুক্তফ্রন্ট আর হবে না। ভারতে এখন এমন একটা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ চলছে, যেখানে কংগ্রেসের ভিতরের ও কংগ্রেসের বাইরের প্রগতিশীলরাই জোটবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করবে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ইতিহাসের গতিধারা ঠিকমত ধরেছেন, তিনিও এই জাতীয় যুক্তফ্রন্টের তীব্র বিরোধী হবেন না বরং প্রগতিশীল নীতি রূপায়ণে এই জাতীয় যুক্তফ্রন্টকে তিনি কাজে লাগাবার চেষ্টাও করতে পারেন।

আলোচনা বৈঠক শেষ হয়ে গেল। তিনতলা থেকে নেমে গাড়িতে উঠবার আগে ক্লোকরুমের সামনে নিজেদের কোট, টুপি নেবার জন্যে লাইন দিয়ে আছি, এমন সময় দেখি—ডঃ কতোভস্কি নেমে আসছেন। আমাকে দেখেই তিনি কাছে এলেন, একটু পাশে ডেকে নিলেন। বললেন, "দ্যাখো, তুমি যে বললে—পশ্চিমবঙ্গে সিদ্ধার্থশংকর রায়ের বিকল্প নেই,—এই কথাটা আমি কিন্তু ঠিক মানতে পারছি না। পশ্চিমবঙ্গ হ'ল অতি উচ্চ শিক্ষা, রুচি ও রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন রাজ্য। সেই রাজ্যে একজন

ব্যক্তির বিকল্প থাকবে না, এটা ঠিক মানা যায় না। পশ্চিমবঙ্গের যে কোনও একটি বিদ্যায়তনের প্রধান, যে কোনও একজন আইনজ্ঞ কেন রাজ্য পরিচালনার যোগ্য হবেন না?"—পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে সোভিয়েত বিশেষজ্ঞের এই ধারণা ও শ্রদ্ধায় নিজেরা খুবই আনন্দ ও গর্ব অনুভব করলাম।

২৩শে মাঝরাত্রে মস্কো বিমানবন্দরে এলাম। রুশদেশ দেখা শেষ। এবার দেশে ফেরার পালা। দ্বিতলে যাত্রীদের বসবার জায়গা। মাইকে দিল্লীগামী বিমানের যাত্রীদের বিমানের দিকে অগ্রসর হবার নির্দেশ দেওয়া হ'ল। শুল্ক বিভাগ ও অন্যান্য পরীক্ষার কাজ আগেই শেষ হয়ে গেছে। লাউঞ্জ থেকে বিমান ক্ষেত্রে যাবার পথে একটি ছোট গেট-এর সম্মুখীন হলাম। একজন ভদ্রমহিলা গেটটার কাছে বসে আছেন। তিনি বিনীত হয়ে বললেন, "আপনার কাছে সোনা, তামা, দস্তা,—এই জাতীয় কোন ধাতব দ্রব্য নেইতো?"—আমি ও শঙ্করবাবু বললাম, "না, না, আমাদের কাছে ঐ জাতীয় কিছু নেই।" শঙ্করবাবু আমার আগে একটা পাটাতনের মত জায়গা দিয়ে দিব্যি সুন্দর হেঁটে চলে গেলেন। এরপর আমি এ জায়গাটার দিকে এগিয়ে চললাম। এই জায়গাটুকু পার হতে হলে একাই যেতে হবে। আমি যেই পাটাতনটার ওপর পা দিয়েছি এমনি দেখি উৎকট ভাবে একটা ঘণ্টা বেজে উঠলো, সঙ্গে সঙ্গে আমার সামনের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। ব্যাপারটা হ'ল এই—কোন নিষিদ্ধ দ্রব্য সে যত গোপনেই দেহের অভ্যন্তরে রাখা হোক না কেন, সেটা বের করে গেটের কাছে ভদ্রমহিলার সমীপে জমা না দিয়ে আপনি গেট পার হতে গেলেই এই ঘণ্টা তারস্বরে বাজবে

আর সামনে একটি দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। আমি তাড়াতাড়ি পাটাতন থেকে নেমে এলাম। কিছুতেই বুঝতে পারলাম না, আমার কাছে কি নিষিদ্ধ দ্রব্য আছে। রিভলভার, পিস্তল-এর প্রশ্নই ওঠেনা: সোনা-দানাও কিছু নেই সঙ্গে। ভদ্র মহিলার কাছে যেতেই তিনি কি বললেন, তার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝলাম না। তবে এইটুকু বুঝলাম, তিনি বলতে চাইছেন, "আপনি যে বললেন আপনার কাছে কিছু নেই, সে কথা সত্যি নয়, আপনার কাছে কি আছে বের করে দিন।" আমিও তাঁকে হাতনেড়ে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, "না আমার কাছে নিষিদ্ধ দ্রব্য কিছুই নেই।" ভদ্রমহিলা নাছোড়বান্দা, তিনি বললেন, "ভালো করে দেখুন, নিশ্চয়ই কিছু আছে।" ভিতরের পকেটে একটা কলম ছিল; সেটা আমার নিজের এবং বহুদিন আগের। বন্ধুবর প্রফুল্ল রায় চৌধুরী নেপাল থেকে এই কলমটা আমার এনে দিয়েছিলেন। যাহোক, সেই কলমটাকে বের করে করে মানিব্যাগ, নোট-বুক-সে দু'টোকেও বের করে টেবিলের পর রেখে গেট মুখো গেলাম। হায় কপাল! পাটাতনে পা পড়তেই আবার সেই ঘণ্টাধ্বনি, আবারা খোলা গেট বন্ধ হয়ে যাওয়া। কি বিপদ! এখন দেখছি নিজেকেই নিজে সন্দেহ করতে হয়। শঙ্করবাবু অদূরে ক্রমেই চিন্তিত হয়ে পড়ছেন। অন্যান্য বিমান-যাত্রী যাঁরা আমার পরে এই গেট পেরুবেন, তাঁরাও বিরক্ত হচ্ছেন। আবার ফিরে এলাম ভদ্রমহিলার কাছে। ভদ্রমহিলা এবার বললেন—অবশ্য তাঁর ভাষায়, "তুমি ভালো করে দেখতো, কিছু আছে নাকি তোমার কাছে।" অনেক হাতড়ে চিন্তা-ভাবনা করে দেখলাম, আমার স্যুটকেসের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি চাবি পৈতের সঙ্গে বাঁধা আছে। অনেক কষ্টে পৈতে থেকে সেই চাবিটা খুলে টেবিলে রাখলাম। একবার ভাবলাম জুতোটাও খুলে ফেলি: কিন্তু

চাবিটা দেখেই ভদ্রমহিলা তার ভাষায় ও ইঙ্গিতে যা বোঝালেন তার মর্ম হ'ল এই—এই ক্ষুদ্র চাবিটাই নিশ্চয়ই তোমায় এই মাঝরাত্রে বিপদে ফেলেছে। চাবিটা ভদ্রমহিলার কাছে রেখে এবার পাটাতনে পা দিতেই দেখলাম, সেই উৎকট ঘণ্টাটা নীরব আর সামনের গেটটাও খুলে গেছে। এবার নিশ্চিন্তে রওনা হলাম। ভদ্রমহিলা আমার কলম-মানিব্যাগ ও উৎপাতসৃষ্টিকারী চাবিটা আমার হাতে তুলে দিয়ে হ্যাণ্ডশেক করলেন।

রাশিয়ায় এই জাতীয় কঠোর নিরাপত্তার এবং সতর্ক প্রহরার কাহিনী আগেই কিছু শুনেছিলাম; এবার নিজেই ভুক্তভোগী হয়ে টের পেলাম। বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত সামসুর রহমান সাহেব একটা গল্প বলেছিলেন। কথাটা উঠেছিল এই বলে যে, আমরা বললাম, এই এতোগুলো রাজ্য ঘুরলাম, এত দেশ দেখলাম কিন্তু কোথাও অস্ত্রধারী সশস্ত্র পুলিস বা অস্ত্রধারী একজন মানুষ চোখে পড়লো না। এতো বড় দেশ চারিদিকে সীমান্ত, সেটা পাহারার কি ব্যবস্থা হয়? সামসুর রহমান বললেন, পাহারার কি ব্যবস্থা আছে, সে কথা বলতে পারবোনা। তবে একটা অভিজ্ঞতা আমার আছে—১৯৭২ সালে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে পালিয়ে তিনজন বাঙালী সোভিয়েত ইউনিয়নে ঢুকে পড়েছিল। পাহাড়, মরুভূমি এলাকায় সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রবেশের তিন মিনিটের মধ্যে তারা ধরা পড়ে গেল। কিন্তু যারা ধরলো এবং যারা ধরা পড়লো, তারা কেউ কারও ভাষা বোঝেনা এবং তাতেও কিছু এসে গেলনা। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ধরাপড়া তিনজনকে এমন জায়গায় হাজির করা হ'লা যেখানে পৃথিবীর যে-কোনও ভাষা বোঝবার মতো লোক আছে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাংলাদেশ দূতাবাসে খবর এলো তিনজন পাকিস্তানী নাগরিক, যারা জাতিতে

বাঙালী, বিনা ছাড়পত্রে রুশদেশে প্রবেশ করে ধরা পড়েছে। খুব শীঘ্রই তাদের তোমার কাছে হাজির করা হবে। সেই তিনজন বাঙালীকে আমি যখন 'বাংলাদেশী' বলে স্বীকার করলাম এবং বুঝিয়ে বললাম, তারা কি কারণে সীমান্ত অতিক্রম করেছে, তখন সেই তিন-জনকে রুশদেশে আশ্রয় দেওয়া হ'ল এবং পরে বাংলাদেশে পৌঁছে দেওয়াও হ'ল। একইভাবে শুনেছিলাম মস্কো এলাকা ঘিরে সত্তরটা অ্যান্টি-মিসাইল সেণ্টার আছে অর্থাৎ যেখান থেকেই, যতদূর থেকেই হোক, যে বোমা বা মারণাস্ত্র মস্কো শহর ধ্বংসের জন্য প্রক্ষিপ্ত হোক না কেন, তা ডিটেক্ট করবার (হদিশ নেবার) ব্যবস্থা এই মিসাইল সেণ্টারে আছে। আমেরিকানরা অবশ্য বলে সত্তর নয়, একশ' ষাটটি মিসাইল সেণ্টার দিয়ে রাশিয়া ঘেরা। যাহোক, এই মিসাইল সেণ্টার, এই সীমান্ত প্রহরা ও বিনা পরীক্ষায় একটা চাবি নিয়েও বিমানে উঠবার সুযোগ না পাওয়া—এর মধ্যে বোঝা যায় কি দৃঢ়-কঠোর নিরাপত্তা-ব্যবস্থা রয়েছে—যা সাদাচোখে অথবা সাধারণভাবে কারো চোখে পড়বারও নয়, বুঝবারও নয়।

মাঝরাত্রে বিমান ছাড়লো। কম্বল টেনে দিলাম শরীরের উপরে। আজ রাত যাবে, কাল সকালে বিমান পৌঁছুবে দিল্লী ; মাঝে কোথাও যাত্রা-বিরতি নেই। রুশ দেশ দেখা শেষ হ'ল। ফিরে চললাম স্বদেশে। চোখ বুঁজে নিজে প্রশ্ন করলাম—কি দেখলাম রুশদেশে, আর কি-ই বা দেখলাম না? দেখলামনা—সোলঝেনিৎসিনকে। দিল্লী থেকে রওনা হওয়ার আগে সকলেই পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেছিলেন, সোলঝেনিৎসিনের সঙ্গে দেখা ক'রো। আমরাও সোলঝেনিৎসিনের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলাম। কিন্তু দিনের পর দিন একের পর এক ব্যক্তির কাছে সোলঝেনিৎসিন সম্পর্কে যা শুনেছি, তারপর তার সঙ্গে দেখা করবার জন্তে আমরা নাছোড়বান্দা হতে পারিনি।* পিকিং হোটেলে

আমরা যেখানে ছিলাম, গোর্কি স্ট্রীটে হোটেল বাড়ির চারখানা বাড়ির পরেই একটা বাড়ির দোতলায় সোলঝেনিৎসিন থাকেন। সেকথা জানা সত্ত্বেও আমাদের সঙ্গে সোলঝেনিৎসিনের দেখা হয়নি। আর কি দেখেছি রাশিয়াতে ?—এ প্রশ্নের জবাব নিজের কাছে নিজে করে উত্তর পেলাম, রুশ বিপ্লব সংঘটিত হবার মাত্র তের বছর পরে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিদর্শনে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন ১৯৩০ সালে। রবীন্দ্রনাথের রুশদেশ পরিদর্শনের পর আরও চল্লিশ বছর কেটে গেছে। এই চল্লিশ বছরে আরও কত না অসম্ভব ঘটনা ঘটে গেছে রুশদেশে। তের বছরের শিশু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রুশদেশ দেখে রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছিলেন, আজ যে-কোন মানুষের কাছে রুশদেশ দেখার পর একই কথা মনে আসবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "আপাততঃ রাশিয়ায় এসেছি, না এলে এ-জন্মের তীর্থ দর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকতো।" যে দেশ না দেখলে সত্যদ্রষ্টা ঋষি কবি রবীন্দ্রনাথের তীর্থ-দর্শন অসমাপ্ত থেকে যায়, সেদেশ দেখার পর আমাদের আর কি বলার থাকতে পারে ?